আমারবই.কম

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

রাতুলের রাত রাতুলের দিন

উপন্যাস

রাতুল ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। চোখ কচলে সে ঘড়িটার দিকে তাকায়, তার চোখে-মুখে প্রথমে অবিশ্বাস তারপর আতঙ্কের একটা ছায়া পড়ল। আটটার সময় তার সদরঘাট লঞ্চঘাটে পৌছানোর কথা– নয়টার সময় চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির একটা জাহাজ সেখান থেকে ছেড়ে যাবে। তার সেই জাহাজে করে যাবার কথা ছিল। রাতুল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে, ঘড়িটাতে ঠিক নয়টা বাজে, ঘণ্টার কাঁটা আর মিনিটের কাঁটার মাঝে নিখুঁত নব্বই ডিগ্রি। সাতটার সময় তার ঘুম থেকে ওঠার কথা ছিল, মোবাইল ফোনে সে সাতটার অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমিয়েছিল, সে উঠেছে নয়টার সময়, দুই ঘণ্টা পর।

• অলঙ্করণ : সব্যসাচী হাজরা

রাতুল বালিশের নিচ থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে, রাতে কোনো একসময় ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাতুল অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার মোবাইল ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকে, এরকম বিশ্বাসী একটা ফোন তার সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করবে সে এখনও বিশ্বাস করতে পারে না। তৃষা নিশ্চয়ই অনেকবার তাকে ফোন করেছে, ফোন বন্ধ, কোনো লাভ হয়নি।

সপ্তাহখানেক আগে তৃষা তাকে জিজ্ঞেস করেছিল তাদের ফিল্ম সোসাইটি জাহাজ ভাড়া করে সুন্দরবন যাচ্ছে, ভলান্টিয়ার হয়ে সে সঙ্গে যেতে চায় কি-না। পরিচিত অনেকে মিলে জাহাজ ভাড়া করে সুন্দরবন যাওয়া খুব মজার একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে তার জন্য ব্যাপারটা অন্য রকম। তৃষাদের ফিল্ম সোসাইটির সবাই সবাইকে চেনে, তারা সবাই মিলে হৈচৈ করতে করতে যাবে, শুধু সে তার মাঝে কাবাব-মে-হাড্ডি হয়ে ঘুরে বেড়াবে– ব্যাপারটা চিন্তা করেই তার উৎসাহ কমে যাবার কথা ছিল। রাতুলের উৎসাহ কমেনি, তার কারণ হচ্ছে তৃষা। সারা জাহাজে তার একমাত্র পরিচিত মানুষ হবে তৃষা এবং সেই তৃষার সাথে চব্বিশ ঘণ্টা সে এক জাহাজে থাকবে সেটা চিন্তা করেই সে এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। তৃষা তখন সব ব্যবস্থা করেছে– আটটার ভেতরে তার সদরঘাট পৌঁছানোর কথা, নয়টার ভেতর জাহাজ ছেড়ে দেবার কথা। অথচ সে ঘুম থেকে উঠেছেই নয়টার সময়– কাঁটায় কাঁটায় নয়টায়। কী ভয়ঙ্কর কথা!

ফোনটা চার্জারে লাগিয়ে সে তৃষাকে ফোন করতে পারে। ফোন করে সে কী বলবে? 'আমি খুবই দুঃখিত তৃষা, ফোনের চার্জ শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই অ্যালার্ম বাজেনি। সে জন্য উঠতে পারিনি।' তৃষা কী বলবে রাতুল অনুমান করতে পারে, 'আমি জানতাম! তুই কোনো কাজ ঠিক করে করতে পারিস না। কেন করতে পারিস না সেই কৈফিয়তটা শুধু ঠিক করে দিতে পারিস।' তারপর একটুও রাগ না হয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলবে, 'ভালো থাকিস রাতুল।'

রাতুল শরীর থেকে কম্বলটা সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে প্রথমবার একটু চিন্তা করার চেষ্টা করে। মাথার মাঝে চিন্তাগুলো কেমন জানি জট পাকিয়ে যাচ্ছিল, তারপরও সে মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করল। এই দেশে কোনো কাজ কেউ সময়মতো করতে পারে না, তাই যে জাহাজটা নয়টার সময় ছেড়ে যাবার কথা সেটা নিশ্চয়ই কোনোভাবেই নয়টার সময় ছেড়ে যেতে পারবে না, সেটা নিশ্চয়ই এখনও লঞ্চঘাটে আছে। আজ শুক্রবার, তাই রাস্তাঘাটে ভিড় খুব বেশি নেই, সে যদি এই মুহূর্তে রওনা দেয় তাহলে ভাগ্য ভালো হলে 'হয়তো'– জাহাজটা ধরে ফেলতে পারবে।

রাতুল তখন লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল। যে ঢিলে পায়জামা আর টি-শার্ট পরে ঘুমিয়েছিল তার ওপরেই জিনসের প্যান্ট আর একটা শার্ট পরে নেয়। বোতাম লাগিয়ে সময় নষ্ট করল না, মোজা পরে টেনিস স্যুটা পায়ে পরে নেয়। বাথরুম থেকে এক খাবলা দিয়ে টুথব্রাশ টুথপেস্ট রেজরগুলো তুলে ব্যাক পেকে ঢুকিয়ে নিল। চেয়ারের ওপর রাখা সোয়েটারটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে টান দিয়ে বিছানার চাদরটা ব্যাক পেকে ঢুকিয়ে ফেলে। বের হয়ে যাবার সময় শেষ মুহূর্তে তার মানিব্যাগটার কথা মনে পড়ল, ড্রয়ার খুলে সেটা বের করে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে সে ছুটতে থাকে। গেটের কাছে কে যেন বলল, 'এই যে ভাই জুতার ফিতা খোলা।' রাতুল ছুটতে ছুটতে বলল, 'জানি।'

মোড়ে সবসময় কয়েকটা সিএনজি থাকে, আজকে নেই। রাতুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে এদিক-সেদিক তাকায়, একটা বাস আসছে, কত নম্বর বাস কোনদিকে যাচ্ছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না, চলন্ত বাসে লাফ দিয়ে উঠে গেল। বাসটা ভুল দিকে রওনা দেওয়ার সময় কন্ডাক্টরের সাথে ঝগড়া করে নেমে গেল। নামতেই একটা কালো রঙের ক্যাব। দরজা খুলে ঢুকে সে চিৎকার করতে থাকে, গুলিস্তানের কাছে একটা ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়তেই ভাড়া মিটিয়ে নেমে সে ছুটতে থাকে। ভিড়টা পার হয়ে সে একটা সিএনজি পেয়ে গেল, খানিকদূর পর আবার জটলা, আবার নেমে সে ছুটতে থাকে। রাস্তা ফাঁকা হবার পর সে হাট্টাকাট্টা জোয়ান একটা রিকশাওয়ালা পেয়ে গেল, সে বাকি পথটা তাকে মোটামুটি উড়িয়ে নিয়ে এলো।

সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনালে নেমে সে ছুটতে ছুটতে ভেতরে ঢুকে যায়। জেটিতে সারি সারি লঞ্চ আর জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে তার মাঝে কোনটি তাদের বোঝার উপায় নেই। টেলিফোনে চার্জ থাকলে তৃষাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারত কিন্তু এখন তার উপায় নেই। মানুষজনকে জিজ্ঞেস করতে করতে সে এগিয়ে যায়, যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে তখন রাতুল জাহাজটাকে দেখতে পেল। জাহাজের ওপর বড় একটা ব্যানার টানানো, সেখানে চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির নাম এবং লোগো। রাতুলের মনে হলো জাহাজটা না দেখতে পেলেই হয়তো ভালো হতো, কারণ সেটা এইমাত্র ছেড়ে দিয়েছে এবং জেটি থেকে সরতে শুরু করেছে। রাতুল যখন ছুটে কাছে গিয়েছে তখন সেটা আট দশ ফুট সরে গিয়েছে, আর কয়েক সেকেন্ড আগে এলেই সে লাফিয়ে উঠে যেতে পারত।

রাতুল হতবুদ্ধি হয়ে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বুড়িগঙ্গার কুচকুচে কালো পানিতে আলোড়ন তৈরি করে জাহাজটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। দুই পাশে দুটি বড় বড় লঞ্চ। রাতুলের হঠাৎ মনে হলো, সেগুলোর কোনো একটা থেকে হয়তো এখনও লাফিয়ে জাহাজটাতে যাওয়া সম্ভব।

রাতুল চিন্তা করে সময় নষ্ট করল না। ডান পাশের লঞ্চে উঠে সে পেছনের দিকে ছুটতে থাকে। একতলা থেকে লাফ দেওয়া সম্ভব নয়, তাই মানুষজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে দোতলায় উঠে যায়। জাহাজটা এখন ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করেছে। লঞ্চ থেকে নেমে সেটা অনেকখানি সরে গেছে, শুধু পেছনের অংশটুকু এখনও কাছাকাছি আছে। রাতুল ছুটতে ছুটতে লঞ্চের পেছনে এসে দাঁড়াল। জাহাজটার মাঝামাঝি অংশ তার সামনে, সে যদি ঠিক করে লাফ দিতে পারে তাহলে হয়তো জাহাজটার রেলিংটা ধরে ফেলতে পারবে। যদি না পারে তাহলে– রাতুল মাথা থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিল, এখন চিন্তা করে নষ্ট করার সময় নেই। যদি সে লাফ দিয়ে জাহাজটা ধরতে চায় তাহলে এখনই লাফ দিতে হবে, কোনো ভালো-মন্দ, সম্ভব-অসম্ভব চিন্তা না করেই।

রাতুল লাফ দিল, অসংখ্য মানুষের চিৎকার শুনতে পেল সে, সেটা সত্যি নাকি মনের ভুল বুঝতে পারল না। যে রেলিংটা ধরার কথা সেটা সে ধরতে পারল না, হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল, নিচে কুচকুচে কালো পানিতে বিপজ্জনক আলোড়ন, এক্ষুনি সে সেখানে ডুবে যাবে, ঠিক তখন তার হাতে কিছু একটা আটকে গেল। রাতুল খপ করে সেটাই ধরে ফেলল। কী ধরেছে সেটা সে জানে না কিন্তু আপাতত সে রক্ষা পেয়েছে, বুক থেকে সে একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয়। শরীরের কোথায় জানি খুব চোট লেগেছে জায়গাটা সে ধরতে পারল না কিন্তু সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা না ঘামালেও চলবে। যে রেলিংটা তার ধরার কথা ছিল রাতুল হাত বাড়িয়ে সেটা ধরল এবং নিজেকে টেনে খানিকটা ওপরে তুলে আনল। জাহাজটার গতি অনেক বেড়ে গিয়েছে, বাড়ুক, তার কোনো সমস্যা নেই– সে এখনও রেলিং ধরে ঝুলে আছে সত্যি কিন্তু সে আর পড়ে যাবে না।

রাতুল প্রথমবার লক্ষ্য করল রেলিংয়ের অন্য পাশে অনেকগুলো বাচ্চা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আসিয়ান শীতলছায়া

রাতুল বাচ্চাগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা খুব কাজ করল বলে মনে হলো না, বাচ্চাগুলো হাসির উত্তর না দিয়ে এখনও ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

রাতুল এবার সাবধানে রেলিংয়ের ওপর নিজেকে টেনে তুলে জাহাজের শক্ত মেঝেতে পা দিয়ে বুকের ভেতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বের করে দেয়।

আট-দশ বছরের একটা ছেলে রাতুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্পাইডারম্যান।'

অন্য সবাই তখন মাথা নাড়ল, বলল, 'স্পাইডারম্যান।'

ছোট একটা মেয়ে বলল, 'স্পাইডারম্যান, তোমার হাত কেটে গেছে।'

রাতুল দেখল তার কনুইয়ের কাছে সত্যি সত্যি বেশ খানিকটা জায়গা থেকে ছাল উঠে গিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। সে হাত দিয়ে রক্তটা মোছার চেষ্টা করে বলল, 'স্পাইডার ব্লাড।'

বাচ্চাদের মুখে এবার হাসি ফুটে ওঠে, তারা মাথা নেড়ে বলল, 'স্পাইডার ব্লাড! স্পাইডার ব্লাড!'

'উঁহু স্পাইডার ব্লাড না।' গলার স্বর শুনে রাতুল পিছন ফিরে তাকাল, কখন সেখানে তৃষা এসে দাঁড়িয়েছে সে জানে না। কটকটে কমলা রঙের একটা টি-শার্ট, মাথায় নীল রঙের বেসবল ক্যাপ, হাতে একটা ফাইল এবং মুখে কামড়ে ধরা একটা বলপয়েন্ট কলম। তৃষা বলপয়েন্ট কলমটা মুখ থেকে সরিয়ে কানের ওপর গুঁজে নিয়ে বলল, 'স্পাইডার ব্লাড লাল রঙের হয় না, স্পাইডার ব্লাড হয় সাদা।'

রাতুল হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'তৃষা!'

তৃষা মুখ শক্ত করে বলল, 'তোর এখানে আসার কথা ছিল সকাল আটটায়। যখন সবাই জাহাজে উঠতে থাকে তখন। তখন ভলান্টিয়ারদের দরকার হয়। তুই একজন ভলান্টিয়ার–'

'আসলে হয়েছে কি–'

'সকাল সাতটা থেকে আমি তোকে ফোন করছি। তোর ফোন বন্ধ–'

'আসলে, ইয়ে মানে ফোনের চার্জ–'

'আমার কথা আটটার সময়, আর তুই এসেছিস দশটার সময়।' রাতুল দুর্বলভাবে বলার চেষ্টা করল, 'এখনও দশটা বাজেনি।'

তৃষা রাতুলের কথাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'শুধু যে দশটার সময় এসেছিস তা নয়, এসে একটা মহা কেরদানি দেখালি। এক জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে অন্য জাহাজে উঠে গেলি– আমাদের রিয়েল লাইফ স্পাইডারম্যান।'

'আসলে ঠিক তখন জাহাজটা ছেড়ে দিল–'

জাহাজ তো ছেড়ে দিবেই। জাহাজ তোর জন্য বসে থাকবে না। আর যদি জাহাজ ছেড়ে দেয় তাহলে তোর উচিত ছিল জেটিতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে আমাদের গুডবাই বলা। তোর স্পাইডারম্যান হয়ে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে লাফ দেবার কথা না। যদি কিছু একটা হতো? যদি পানিতে পড়ে যেতি–'

'আমি খুব ভালো সাঁতার জানি। বুড়িগঙ্গার পানিতে এত পলিউশান যে, সাঁতার না জানলেও ভেসে থাকার কথা।'

'ফাজলেমি করবি না। সাঁতার জানা না জানার কথা হচ্ছে না। কাছাকাছি এতগুলো লঞ্চ, জাহাজ– তাদের প্রপেলার ঘুরছে। পানির টানে যদি প্রপেলারে ঢুকে যাস তাহলে টুকরো টুকরো হয়ে যাবি। মানুষ বোকা না হলে এরকম রিস্ক নেয়?'

রাতুল হাসার চেষ্টা করে বলল, 'আমি তো কখনও দাবি করিনি আমি বুদ্ধিমান।'

'তাই বলে এত বোকা–'

'আসলে, আসলে–'

'আসলে কী?'

রাতুল আশেপাশে তাকাল, তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'তুই আশেপাশে থাকলেই আমি কেমন জানি বোকা হয়ে যাই। খোদার কসম।'

তৃষা সরু চোখে কিছুক্ষণ রাতুলের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'দেখ রাতুল, তোকে একটা ব্যাপার খুব ভালো করে বলে দেওয়া দরকার।'

'কী?'

'তুই আর আমি হচ্ছি বন্ধু। বুঝেছিস? বন্ধু।'

'বুঝেছি।'

'শুধু বন্ধু।' তৃষা 'শুধু' কথাটাতে অনাবশ্যকভাবে জোর দিল। রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'মনে আছে। শুধু বন্ধু।' রাতুলও শুধু কথাটাতে জোর দিল, অপ্রয়োজনীয় এবং অনাবশ্যক জোর!

রাতুল যেহেতু এই জাহাজের কাউকে চেনে না তৃষা তাই তাকে নিয়ে বের হলো সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। প্রথমে দেখা হলো আলমগীর ভাইয়ের সাথে। আলমগীর আলম মৌটুসি অ্যাড ফার্মের মালিক, মৌটুসি তার মেয়ের নাম। মেয়ের বয়স আট। যার অর্থ আট বছরের মাঝে একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে আলমগীর আলম ফার্মটি দাঁড়া করিয়েছেন। সেখান থেকে যে টাকা-পয়সা আসে তার বেশিরভাগ ফিল্ম সোসাইটির পেছনে খরচ করেন। গত বছর 'মাহী এবং তার লাল বেলুন' নামে বাচ্চাদের জন্য একটা সিনেমা তৈরি করেছেন– সিনেমাটা পুরোপুরি ফ্লপ গেছে কিন্তু সেটা নিয়ে তার খুব একটা মাথাব্যথা নেই। আলমগীর আলমের একটা বড় গুণ আছে যে কোনো বয়সের মানুষকে একত্র করিয়ে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

আলমগীর ভাই ডেকে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন, তৃষাকে দেখে বললেন, 'সব ঠিক আছে তৃষা?'

'ঠিক আছে, নো প্রবলেম।' তারপর রাতুলকে দেখিয়ে বলল, 'এই হচ্ছে রাতুল, যার কথা বলেছিলাম। নতুন ভলান্টিয়ার।'

আলমগীর ভাই রাতুলকে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন, তারপর বললেন, 'আমার মেয়ে মৌটুসি একটু আগে আমাকে বলে গেছে তুমি নাকি স্পাইডারম্যানের মতো উড়তে পার। আকাশ থেকে উড়ে নাকি ল্যান্ড করেছ।'

রাতুল অপ্রস্তুতের মতো হেসে বলল, 'কাজটা খুব স্টুপিডের মতো হয়েছে–'

'বাচ্চাদের তা মনে হয়নি। তারা খুবই ইমপ্রেসড। সবাই এখন ওড়া প্র্যাকটিস করছে। জাহাজের ভেতরে থাকলে ঠিক আছে– জাহাজ থেকে বাইরে না উড়ে যাবার চেষ্টা করে!'

রাতুল মাথা নাড়ল, 'করবে না। বাচ্চারা ছোট হতে পারে কিন্তু তারা আমার মতো গাধা না।'

আলমগীর ভাই হাসলেন, সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'না, না– গাধা কেন হবে। তৃষা সারাক্ষণ রাতুল রাতুল করতে থাকে। তুমি গাধা হলে তৃষা তোমাকে পাত্তা দিত মনে করেছ?'

তৃষা চোখ পাকিয়ে বলল, 'আমি কখন রাতুল রাতুল করেছি আলমগীর ভাই? মোটেও করিনি। শুধু গত সপ্তাহে–'

আলমগীর ভাই তৃষাকে থামালেন, 'ঠিক আছে করনি। মাই মিসটেক।' তারপর রাতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে রাতুল। ওয়েলকাম টু আওয়ার ফ্যামিলি। তৃষা হচ্ছে আমাদের কমান্ডার ইন চিফ। তার আন্ডারে আমাদের ভলান্টিয়ার বাহিনী– তুমিও সেই বাহিনীতে যোগ দিয়ে দাও।'

দাও।'

'জি দেব। সেই জন্য উড়ে চলে এসেছি।'

'গুড। আবার উড়ে চলে যাবে না তো!'

'না যাব না।'

তৃষা তারপর রাতুলকে নিয়ে অন্য ভলান্টিয়ারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। বেশিরভাগই তাদের মতো ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী। হাসি-খুশি উজ্জ্বল চেহারার ছেলেমেয়ে। তৃষার বন্ধু-বান্ধব। ছোট বাচ্চাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হলো না। তারা সবাই তাকে স্পাইডার আংকেল ডাকছে। সেজেগুজে থাকা কিছু পুরুষ-মহিলাও আছেন। তৃষা রাতুলকে নিয়ে তাদের কাছে গেল না। গলা নামিয়ে বলল, 'এরা হচ্ছে আমাদের স্পন্সরদের ফ্যামিলি। আমি নিজেও চিনি না। এদের বেশি খাতির-যত্ন করতে হবে, যেন সামনের বছরও আমাদের স্পন্সর করে।'

দোতলার কেবিনের কাছে গিয়ে বলল, 'এই কেবিনে আমাদের ইনভাইটেড গেস্টরা আছে। বড় বড় মানুষজন কবি সাহিত্যিক ফিল্ম মেকার। বিকেলে যখন সবাইকে নিয়ে গেট টুগেদার হবে, তখন তাদের সাথে পরিচয় হবে। আমরা এদের ঘাঁটাই না।'

'কেন?'

'কবি সাহিত্যিক ফিল্ম মেকার এরা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ মানুষ। ক্রিয়েটিভ মানুষদের থেকে দূরে থাকতে হয়।'

'কেন?'

'এরা কখন কী করবে বলা মুশকিল। সবসময় ভালো করে কিছু দেখে না, বোঝে না, কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না। উদাস উদাস ভাব। কিন্তু আসলে চোখের কোনা দিয়ে সবকিছু দেখে, সবকিছু বোঝে। আয়নার সামনে আধাঘণ্টা দাঁড়িয়ে চুল এলোমেলো করে চেহারায় উদাস উদাস ভাব আনার জন্য!'

তৃষার কথার ভঙ্গি শুনে রাতুল হেসে ফেলল। বলল, 'তুই কবি-সাহিত্যিকদের ওপর খুব খ্যাপা মনে হচ্ছে।'

'শুধু কবি-সাহিত্যিক না। কবি-সাহিত্যিক আর ফিল্ম মেকার।'

'কেন?'

'কাছে থেকে দেখিসনি তো সেই জন্য জিজ্ঞেস করছিস। এখানে এসেছিস, এখন কাছে থেকে দেখবি। তাহলে বুঝতে পারবি।'

দুপুর বেলাতেই রাতুল তৃষার কথাটার অর্থ বুঝতে পারল। সদরঘাট থেকে রওনা দিয়ে জাহাজটা তখন অনেক দক্ষিণে চলে এসেছে। প্রথম কয়েক ঘণ্টা নদীর দু'পাশে শুধু ইটের ভাটা, পৃথিবীতে ইটের ভাটা থেকে কুৎসিত কিছু হতে পারে কি-না রাতুলের জানা নেই। ধীরে ধীরে ইটের ভাটা কমে এলো, মাঝে মাঝে গ্রাম উঁকি দিতে থাকে, একসময় প্রায় হঠাৎ করে নদীর দুই পাশে গ্রাম। বাংলাদেশের সবুজ গ্রাম। রাতুল রেলিংয়ে ভর দিয়ে নদী তীরে তাকিয়ে ছিল, তখন তৃষা তাকে নিচে ডেকে পাঠাল।

রাতুল নিচে গিয়ে দেখে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ছোট বাচ্চারা হাতে খাবারের প্লেট নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করছে। বড়দের আলাদা লাইন, সেখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মুখে এক ধরনের অপ্রস্তুত ভাব, বোঝাই যাচ্ছে খাবারের জন্য তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে অভ্যাস নেই। রাতুলকে দেখে তৃষা বলল, 'রাতুল, তুই বাচ্চাদের সামলা।'

'কী করতে হবে।'

'প্লেটে খাবার তুলে দে। আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কেবিনে।' তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'কবি-সাহিত্যিক, ফিল্ম মেকারদের ডেকে আনি।'

টেবিলের ওপর বড় বড় গামলায় খাবার, তাকে খাবার তুলে দিতে হবে। বাচ্চাদের লাইনে সবার আগে দাঁড়ানো ছোট মেয়েটা, খাবারের দিকে তাকিয়ে নাক কুঁচকে বলল, 'আর কিছু নাই?'

রাতুল থতমত খেয়ে বলল, 'আর কী চাও?'

'হাম বার্গার।'

না। রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'না আজকে শুধুমাত্র ডাইনোসরের মাংস।'

আমারবই.কম

সামনে দাঁড়ানো বাচ্চাগুলো একসাথে চিৎকার করে উঠল, 'ডাইনোসর?'
'হ্যাঁ।' রাতুল গম্ভীর হয়ে একটা মুরগির রান ওপরে তুলে বলল, 'এই দেখো ডাইনোসরের ঠ্যাং।'
সামনে দাঁড়ানো মেয়েটা হিহি করে হেসে বলল, 'এটা চিকেন!'
'মোটেও চিকেন না। এটা ডাইনোসর।'
'ডাইনোসর কত বড় হয়–'
'এগুলো ডাইনোসরের বাচ্চা। দাও প্লেট দাও।'
মেয়েটা প্লেট এগিয়ে দিল। রাতুল প্লেটে এক চামচ ভাত দিয়ে বলল, 'শুধু ডাইনোসরের ঠ্যাং খেলে তো হবে না। সাথে কিছু ঘাসের বিচি দিয়ে দিই। ফ্রেশ জঙ্গল থেকে তুলে এনেছি।'
মেয়েটা আনন্দে হাসতে থাকে, সবজিটা দেখিয়ে বলে, 'আর এটা কী?'
রাতুল এক চামচ সবজি তুলে বলল, 'এর সাথে অনেক কিছু আছে। মাদাগাস্কার থেকে এসেছে টিউবারসাম, অস্ট্রেলিয়া থেকে লাইকোপারসিকাম, উরুগুয়ে থেকে ব্রাসিকা ওলেরাসিয়া, আর্জেন্টিনা থেকে মেলংগিনা–'
রাতুল আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, মেয়েটা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা– এটা সবজি।'
'এটা মোটেও সবজি না।' রাতুল মুখ গম্ভীর করে বলল, 'এর মাঝে অনেক কিছু আছে। ভাইটামিন এ থেকে জেড পর্যন্ত সবকিছু আছে।'
মেয়েটা এবার একটু মজা পেয়ে গেছে, ডালটা দেখিয়ে বলল, 'আর এটা কী?'
'এটা খুবই স্পেশাল স্যুপ। স্পেনের রাজার জন্য তৈরি করেছিল, আমাদের স্পেশাল এজেন্ট তোমাদের জন্য চুরি করে এনেছে। এর মাঝে আছে টারমারিক এলিয়াম আর গাঠাঞ্জো।'
মেয়েটা তার প্লেট হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, রাতুল তাকে থামাল, 'দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছ?'
'দাম?'
'হ্যাঁ। এই খাবারের দাম দিতে হবে না?'
রাতুল ঠাট্টা করছে বুঝতে তার একটু সময় লাগল। বোঝা মাত্র তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, 'কত দাম?'
'একশ ডলার।'
মেয়েটা হাত মুঠো করে তার দিকে হাত এগিয়ে দেয়, 'এই নাও– এক মিলিয়ন ডলার।'
রাতুল খুশি হওয়ার ভান করে বলল, 'থ্যাংকু। থ্যাংকু। তুমি নিশ্চয়ই একজন প্রিন্সেস। তা না হলে কেউ এত টাকা দেয়। কী নাম তোমার প্রিন্সেস?'
'মৌটুসি।'
'থ্যাংকু প্রিন্সেস মৌটুসি।' তারপর হাত ওপরে তুলে অদৃশ্য একটা কিছু ধরে গলা উঁচু করে বলল, 'এই যে সবাই দেখ, প্রিন্সেস মৌটুসি আমাকে এক মিলিয়ন ডলার দিয়েছে।'
বাচ্চারা আনন্দের মতো শব্দ করল, বড়দের লাইনে দাঁড়ানো অনেকেই হাসি হাসি মুখ করে রাতুলের দিকে তাকাল।
একটু পর তৃষা এসে কয়েকটা প্লেটে খাবার সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, রাতুল জিজ্ঞেস করল, 'কার জন্য নিচ্ছিস?'
'কবি সাহিত্যিক ফিল্ম মেকার।'
'অন্যদের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে নেয় না কেন?'
'তোর মাথা খারাপ হয়েছে? তারা লাইনে দাঁড়াবে?
রাতুল দেখল কয়েকজন আধবুড়ো মানুষকে আলাদা করে বসিয়ে খাবারের আয়োজন করা হয়েছে, তারা খুব গম্ভীরভাবে খাচ্ছে এবং অন্যরা তাদের সমাদর করছে।
একটু পরেই তৃষা এসে রাতুলের পাশে দাঁড়াল, বাচ্চারা রীতিমতো ধাক্কাধাক্কি করে খাবার নিচ্ছে দেখে তৃষা একটু অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার? এরা রীতিমতো মারামারি করছে খাবার নিতে? আমরা ভেবেছিলাম এদের খাওয়া নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হবে। হামবার্গার, ফ্রায়েড চিকেন আর পিৎজা ছাড়া এরা আর কিছু খেতে চায় না।
রাতুল হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'তোমরা যদি ভাত, মুরগির মাংস, সবজি, ডাল এসব খেতে দাও তাহলে তো বাচ্চারা আপত্তি করবেই।'
তৃষা বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে বলল, 'মানে?'
'দেখছ না আজকের মেনু। ডাইনোসরের মাংস, ঘাসের বিচি–'
রাতুল সামনের ছোট ছেলেটার প্লেটে খাবার তুলে দিতে দিতে বলল, 'সব শেষ করতে হবে কিন্তু। ঠিক আছে?'
ছেলেটা মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিল, রাতুল থামাল, 'কী হলো সুপারম্যান, টাকা দিলে না? একশ ডলার প্লেট।'
ছেলেটা লাজুক মুখে রাতুলের হাতে অদৃশ্য ডলার তুলে দিয়ে হাসল, দেখা গেল তার সামনের দুটি দাঁত নেই। রাতুল ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'সুপারম্যান, তোমার সামনের দুটি দাঁতের কী হয়েছে? ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে নাকি? মুখ হাঁ করে ঘুমাচ্ছিলে নিশ্চয়ই–'
'না।' ছেলেটা ঝপ করে মুখ বন্ধ করে ফেলল।
'তাহলে?'
'পড়ে গেছে।'
'সর্বনাশ! এখন কী হবে?'
'আবার উঠবে।'
'যদি না ওঠে?'
ছেলেটা মুখ যথাসম্ভব বন্ধ রেখে বলল, 'উঠবে, উঠবে।'
পেছনে দাঁড়ানো একটি মেয়ে বলল, 'স্পাইডার আংকেল, তুমি জান না দাঁত পড়ে গেলে আবার ওঠে? যে দাঁতটা পড়ে যায় সেটাকে বলে দুধদাঁত।'
'আর যেটা ওঠে সেটাকে?'
'সেটা শুধু দাঁত।'
'উহুঁ' রাতুল মাথা নাড়ল, 'সেটা হচ্ছে, 'মাংস দাঁত।'
তৃষা খানিকক্ষণ রাতুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই পারিসও বটে। আপিস তোকে আসতে বলেছিলাম– বাচ্চাগুলোকে ম্যানেজ করতে পারবি।'
রাতুল গলা নামিয়ে বলল, 'তুই যদি আমার পাশে থাকিস তাহলে আমি যে কোনো মানুষকে ম্যানেজ করতে পারব। চাইলে ওই কবি সাহিত্যিক ফিল্ম মেকারদেরকেও–'
'ফাজলেমি করবি না–'
খাবার যখন শেষের দিকে তখন আধবুড়ো টাইপের একজন রাতুলের দিকে এগিয়ে এলেন, তৃষার কবি সাহিত্যিক ফিল্ম মেকারদের একজন। রাতুলের দিকে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি কি জান শিশুদেরকে, কোমলমতি শিশুদেরকে কখনও প্রতারণা করতে হয় না?'
রাতুল ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। কোমলমতি, প্রতারণা– এসব শব্দ সে বইয়ে পড়েছে, মুখের কথায় কেউ ব্যবহার করতে পারে ধারণা করেনি। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।
আধবুড়ো টাইপের মানুষটি বললেন, 'আমি লক্ষ্য করলাম শিশুগুলো বলছে তারা ডাইনোসরের মাংস খাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, ডাইনোসরের মাংস খাওয়ার ভান করার জন্য তারা তাদের আচরণে একটা বর্বরতার রূপ ফোটানোর চেষ্টা করছে।'
রাতুল চেষ্টা করে বলল, 'আমি মানে ইয়ে–'
আধবুড়ো মানুষটি বললেন, 'তারা মোটেও ডাইনোসরের মাংস খাচ্ছে না। কাজেই তাদেরকে সেটি বলা ভুল। তারা শিশু বলে তাদেরকে ভুল, মোটা

আশিয়ান শীতলছায়া

দাগে আমি ভুল শব্দটি ব্যবহার করছি, যদি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করি আমি মিথ্যা শব্দটাও ব্যবহার করতে পারতাম, কিন্তু আমি ভুল শব্দটিই ব্যবহার করছি, শিশুদেরকে ভুল তথ্য দেওয়া ঠিক নয়।'
রাতুল একবার ঢোক গিলে বলল, 'আমি আসলে মজা করছিলাম।'
'আমি সেটি অনুমান করেছি। শিশুদের ব্যাপারে আমি খুব স্পর্শকাতর। তাদের সাথে সঠিক ব্যবহার করা হয় না বলে নতুন প্রজন্মের সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ হয় না।'
রাতুল এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, কী বলবে সেটাও ঠিক করেছে। বাচ্চাগুলো খুব ভালো করে জানে, এটা ডাইনোসরের মাংস নয়, তাদেরকে কোনো ভুল তথ্য দেওয়া হয়নি, এটা এক ধরনের খেলা, বিষয়টা যখন বলতে শুরু করেছে আধবুড়ো মানুষটি তখন হাত নেড়ে রাতুলকে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে হেঁটে চলে গেলেন। রাতুল মাথা ঘুরিয়ে তৃষার দিকে তাকাল, তৃষা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাসি থামানোর চেষ্টা করছে। রাতুল বলল, 'দেখলি? দেখলি ব্যাপারটা?'
'তোকে আমি আগেই বলেছিলাম–'
'কে মানুষটা?'
'সর্বনাশ, তুই কবি শাহরিয়ার মাজিদকে চিনিস না?'
'না। আমি মাজিদ, বাবাজিদ কাউকেই চিনি না।'
'বিখ্যাত কবি। অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। তোর সাথে যে কথা বলেছে সে জন্যই তোর জীবন ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা।'
'আমার সাথে মোটেই কথা বলেনি– আমাকে গালাগাল করে চলে গেছে। আমি যখন কথা বলতে চেয়েছি তখন আমার কথা না শুনে চলে গেছে। মানুষ যেভাবে মাছি তাড়ায় ঠিক সেইভাবে হাত দিয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'
তৃষা হাসি চেপে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন প্রথমে সরু গলায় একটা চিৎকার, তারপর সম্মিলিত অনেকগুলো চিৎকার শোনা গেল। জাহাজের পেছনে একটা জটলা তৈরি হয় এবং সেখান থেকে উত্তেজিত গলার স্বর শোনা যেতে থাকে। রাতুল আর তৃষা ছুটে গেল, ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় একটা বেঞ্চের নিচে উবু হয়ে অনেকে দেখছে।
'কী?' তৃষা বেঞ্চের নিচে উঁকি দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে এখানে?'
'মানুষ।' একটা বাচ্চা উত্তেজিত গলায় বলল, 'একটা মানুষ বেঞ্চের নিচে লুকিয়ে আছে।'
'সত্যি?'
'হ্যাঁ।'
এবার রাতুলও উঁকি দিল। সত্যি সত্যি বেঞ্চের নিচে খানিকটা দূরে অন্ধকারে একজন মানুষ গুটিশুটি মেরে লুকিয়ে আছে। তৃষা বলল, 'সাবধান। হাতে কিছু থাকতে পারে।'
এ রকম সময় জাহাজের একজন খালাসি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো, সে একনজর দেখেই ব্যাপারটা বুঝে গেল, বেঞ্চের সামনে উবু হয়ে সে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মানুষটার চুলের মুঠি ধরে টেনে বের করে আনে। বাইরে টেনে আনার পর বোঝা যায় এটা একজন বড় মানুষ না, এটা একটা বাচ্চা। বয়স আট-দশ বছরের বেশি না। বেঞ্চের নিচে আবছা অন্ধকারে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না বলে বোঝা যায়নি। খালাসিটা কোনো কথা না বলে ছেলেটার চুল ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মারতে শুরু করে।
তৃষা আর রাতুল ঝাঁপিয়ে পড়ে খালাসিটাকে থামাল। তৃষা বলল, 'কী করছেন আপনি? মারছেন কেন ওকে?'
'মাইর ছাড়া এরা আর কিছু বোঝে না।'
খালাসিটা নাকমুখ কুঁচকে বলল, 'এরা যে কী বদমাইশ আপনারা জানেন না।'
'কেন? কী হয়েছে ওদের?'
'সব সময় এভাবে লুকায়া জাহাজে উঠে যায়। তারপর চুরি করে পালায়।' বাচ্চা ছেলেটা মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল, 'না।'
রাতুল জানতে চাইল, 'তাহলে জাহাজে উঠে লুকিয়ে আছ কেন?'
ছেলেটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, কিছু বলল না। হাত দিয়ে নাকটা মুছল, সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। রাতুল বলল, 'কী হলো? কথা বলছ না কেন? বল কেন উঠেছ?'
ছেলেটা আরও মাথা নিচু করে কিছু একটা বলল। রাতুল ঠিক বুঝতে পারল না। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী বললে?'
ছেলেটা মাথাটা একটু উঁচু করে বলল, 'আপনাগো লগে সুন্দরবন যামু।'
খালাসিটা এ কথা শুনে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, বাচ্চাটার ঘাড় ধরে চিৎকার করে বলল, 'কী, কী কইলি হারামজাদা? সুন্দরবন যাবি? শখ দেখে বাঁচি না।'
রাতুল ছেলেটাকে মুক্ত করে বলল, 'তুমি আমাদের সাথে সুন্দরবন যেতে চাও?'
'হ্যাঁ।'
তাদের ঘিরে একটা ছোটখাটো ভিড় হয়েছে, সেখান থেকে এবার একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। খালাসিটা আবার এগিয়ে আসে, বলে, 'আয় আমার সাথে, তোরে আমি এক লাথি দিয়ে সুন্দরবন পাঠামু।'
রাতুল বলল, 'আপনি কী বলছেন এসব? ছিঃ।'
'আমার হাতে দেন, আমি এর ব্যবস্থা করি।'
'কী ব্যবস্থা করবেন?'
'জাহাজ থামায়া কোনো একটা নৌকাতে তুলে দেব।'
'নৌকায় তুলে দেবেন? তারপর?'
'নৌকা ওরে পাড়ে নামায়া দেবে।'
'তারপর সে কেমন করে সদরঘাট যাবে?'
'সেইটা আমার চিন্তার ব্যাপার না। সেইটা এই হারামজাদার চিন্তা।'
ওদের ঘিরে থাকা মানুষগুলোর ভেতর থেকে কে যেন বলল, 'ওরা স্টিট স্মার্ট– নিজেরা ম্যানেজ করে নেবে।'
'পথশিশু যে রকম থাকে এরা হচ্ছে সে রকম জলশিশু।' রাতুল তাকিয়ে দেখল কবি শাহরিয়ার মাজিদের মুখে এক ধরনের স্নিগ্ধ হাসি, সেই হাসিটাকে আরও বিস্তৃত হতে দিয়ে বললেন, 'এই জলশিশু এক জলযান থেকে অন্য জলযানে করে গন্তব্যে পৌঁছে যাবে।'
রাতুল সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাচ্চা একটা ছেলে আমাদের সাথে সুন্দরবন যেতে চাচ্ছে, একে নিয়ে গেলে সমস্যা কী?'
সবাই চুপ করে রইল, শুধু খালাসিটা মাথা নেড়ে বলল, 'না। না।'
রাতুল বলল, 'একজন মানুষ, কী আসে যায়?'
কবি শাহরিয়ার মাজিদের মুখের স্নিগ্ধ হাসি হঠাৎ করে উবে গেল, মুখ সূচালো করে বললেন, 'এদের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। জাহাজের প্রচলিত নিয়ম মেনে নৌকায় তুলে দেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত।'
রাতুলের ইচ্ছে হলো বলে, 'এই শিশুদের বেলায় আপনি স্পর্শকাতর নন? এর সুকুমার মনোবৃত্তি বিকাশ নিয়ে আপনার কোনো দুর্ভাবনা নেই?' কিন্তু সে কিছুই বলল না।
এ রকম সময় আলমগীর ভাই এসে ভিড় ঠেলে ঢুকলেন। তার মেয়ে মৌটুসি গিয়ে বাবার হাত ধরে তাকে ফিসফিস করে কিছু একটা বলল। আলমগীর ভাই মাথা নাড়লেন, বললেন, 'ঠিক আছে।'
তৃষা বলল, 'আলমগীর ভাই, এই ছেলেটা লুকিয়ে জাহাজে উঠে গেছে–'
'শুনেছি, লুকিয়ে না উঠে এর কি অন্য কোনোভাবে ওঠার উপায় আছে?'
'তা নেই। কিন্তু–'
'কিন্তু কী?'
'জাহাজের লোকজন ওকে একটা নৌকায় নামিয়ে

দিতে চাচ্ছে।'
'কিন্তু আমার মেয়ে বলছে ওকে নিয়ে নিতে। কী বল?'
রাতুল কথাটা লুফে নিয়ে বলল, 'আমিও তাই বলছি। বাচ্চা একটা ছেলে সুন্দরবন যেতে চাইছে–'
'ঠিক আছে তাহলে।' আলমগীর ভাই ছেলেটার দিকে তাকালেন, 'তোমার নাম কী?'
'রাজা।'
'একেবারে রাজা? মন্ত্রী-কোটাল না?'
বাচ্চাটা থতমত খেয়ে বলল, 'না। রাজা।'
'তুমি যাবে আমাদের সাথে, কিন্তু কোনো রকম দুষ্টুমি করতে পারবে না। আমাদের কথা মেনে চলতে হবে। ঠিক আছে?'
ছেলেটার এগাল থেকে ওগাল জোড়া হাসি ফুটে ওঠে, 'ঠিক আছে।'
রাতুল খুশি খুশি গলায় বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ওকে দেখে রাখব।'
'গুড।'
কবি শাহরিয়ার মাজিদ একটা নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, 'কাজটা ঠিক হলো না।'
রাতুল কথাটা না শোনার ভান করে ছেলেটাকে বলল, 'রাজা।'
'জে।'
'তুমি শেষবার কবে গোসল করেছ?'
'জে, আমি পেরতেক রোজ গোসল করি।'
'গোসল করার কথা পানি দিয়ে। তুমি নিশ্চয়ই আলকাতরা দিয়ে গোসল কর?'
'জে না–'
তৃষা বলল, 'বুড়িগঙ্গার পানি দিয়ে গোসল করা আর আলকাতরা দিয়ে গোসল করার মাঝে পার্থক্য নাই।'
রাতুল বলল, 'তোমাকে অন্তত একবার সাবান দিয়ে গোসল করতে হবে আমার সামনে।'
'জে, করব।'
'তার আগে খেয়ে নাও।'
মোটাসি দাঁত বের করে হেসে বলল, 'ঘাসের বিচি আর ডাইনোসরের মাংস। তাই না স্পাইডার আংকেল?'
রাতুল মাথা নাড়ল, চোখের কোনা দিয়ে দেখল কবি শাহরিয়ার মাজিদ হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছেন।
রাজাকে গোসল করানোর সময় বাচ্চাদের প্রায় সবাই সেখানে উপস্থিত থাকল। দড়ি লাগানো বালতি দিয়ে রাতুল নদী থেকে পানি তুলে রাজার মাথায় ঢালতে লাগল আর রাজা প্রবল বেগে সারা শরীরে সাবান মেখে গোসল করতে লাগল। গোসল করার পর তৃষা তাকে একটা টি-শার্ট দিল, বাচ্চাদের ভেতর থেকে একটা প্যান্ট খুঁজে বের করা হলো। পরিষ্কার কাপড় পরার পর দেখা গেল তাকে অন্য বাচ্চাদের থেকে খুব আলাদা করা যাচ্ছে না!
বিকেল বেলা জাহাজের নিচতলায় সবাই একত্র হয়েছে। প্লাস্টিকের চেয়ারে বড়দের বসার ব্যবস্থা, মাঝখানে কার্পেট বিছানো হয়েছে, সেখানে ছোটদের বসার ব্যবস্থা। তাদের অবশ্য বসার আগ্রহ নেই, এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছে।
আলমগীর ভাই মাইক্রোফোন নিয়ে বললেন, 'বস, সবাই বস।'
একটি বাচ্চা জিজ্ঞেস করল, 'কেন আংকেল? বসতে হবে কেন?'
'এখন সবার সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।'
'কেন আংকেল?'
'আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি, সবার সাথে সবার পরিচয় থাকতে হবে না?'
রাতুল ব্যাখ্যা করে দিল, 'মনে কর সুন্দরবনে বাঘ একজনকে খেয়ে ফেলল, তাহলে আমাদের জানতে হবে না কাকে খেয়েছে?'
এই ব্যাখ্যাটি বাচ্চাদের পছন্দ হলো, এবার তারা কার্পেটে বসে যায়।
আলমগীর ভাই মাইক্রোফোনে বললেন, 'সবাইকে আমাদের সুন্দরবন ভ্রমণে আমন্ত্রণ। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য কী কে বলতে পারবে?'
ছোটরা চিৎকার করে নিজেদের মতো উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে থাকে, বড়রা হাসি হাসি মুখে বসে থাকে। আলমগীর ভাই এক-দুইজনের কথা শুনে মাথা নেড়ে বললেন, 'হয় নাই। আমাদের উদ্দেশ্য খুব সহজ। যে কয়জন যাচ্ছি ঠিক সেই কয়জন ফিরে আসা! আমরা কাউকে সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খাবার হিসেবে রেখে আসতে চাই না। বুঝেছ?'
সবাই হি হি করে হেসে মাথা নাড়তে থাকে। আলমগীর ভাই বললেন, 'এবার আমরা পরিচয় পর্ব সেরে নিই। অনেকে অনেককে চেনে আবার অনেকে চেনেও না। এই হচ্ছে সুযোগ, সবাই সবার পরিচয় দেবে।'
রাতুল ভেবেছিল পরিচয় পর্বটা হবে একঘেয়ে আর বিরক্তিকর কিন্তু দেখা গেল সেটা মোটামুটিভাবে উপভোগ্যই হলো।
টেলিভিশনে অত্যন্ত সুন্দর অভিনয় করে একটি মেয়ে, নাম শারমিন, খুব সুন্দর চেহারা। কিন্তু মুখ ফুটে কথাই বলতে পারে না। তার পাশেই সব সময় বসে আছেন তার মা, তীক্ষ্ণ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন, কেউ যেন তার কোনো ক্ষতি করতে না পারে। নাট্যকার বাতিউল্লাহ একটু জোকার টাইপের, সাধারণভাবে কথা বলতেই পারেন না, প্রত্যেকটা কথার মাঝেই একটা প্যাঁচ লাগিয়ে দেন। কবি শাহরিয়ার মাজিদ নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, 'আমি শব্দের কারিগর। একটা অতি সাধারণ শব্দের পাশে আরেকটা অতি সাধারণ শব্দ এমনভাবে এনে দাঁড়া করিয়ে দিই যখন দুটো শব্দই হঠাৎ করে অসাধারণ হয়ে ওঠে।' রাতুল তার কথা শুনে দাঁত কিড়মিড় করে মনে মনে বলল, ন্যাকামো দেখে মরে যাই! একজন চিত্রপরিচালক, নাম আজাদ আজাদ– এ রকম নাম রাতুল জন্মেও শোনেনি। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে চলচ্চিত্র জগতের সংকটের ওপর একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। কিছু কিছু মানুষ খুবই নার্ভাস টাইপের, উঠে দাঁড়িয়ে শুধু নামটা বলতে গিয়েই থেমেটেমে একসার। ভলান্টিয়ার একটা মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, নাম গীতি, কথায় কথায় হেসে ভেঙে পড়ে। হাসি খুবই সংক্রামক একটা বিষয়, তার হাসি শুনে অন্যরাও হেসে গড়াগড়ি খেতে থাকে। নিজের পরিচয় দেওয়ার বেলায় ছোট বাচ্চাদের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি, তারা সবাই নিজেদেরকে জুনিয়র ভলান্টিয়ার হিসাবে দাবি করতে থাকে। রাতুল জানতে পারল, সবচেয়ে দুরন্ত ছেলেটির নাম হচ্ছে শান্ত– এ রকম ভুল নামকরণ নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। টুম্পা নামে আরেকজন বাচ্চা ভলান্টিয়ার গত ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রধান অতিথিকে বাথরুম দেখাতে নিয়ে গিয়ে ভুল করে বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়েছিল। টুবলু অতিথিদের চা এনে দিতে গিয়ে একজন স্পন্সরের কোলে গরম চা ফেলে দিয়েছিল– এ তথ্যগুলোর সব পুরোপুরি সত্য নয়– কিছু কিছু অতিরঞ্জিত কিন্তু সবাই সেগুলো নিয়ে হৈচৈ করতে পছন্দ করে।
সবার সাথে রাজাকেও তার পরিচয় দিতে বলা হলো। সে নিজে থেকে কিছু বলতে পারছিল না, কিন্তু প্রশ্ন করে করে যে উত্তর পাওয়া গেল তা অসাধারণ। যেমন– তারা তিন ভাই এবং অন্য দু'জনের নাম বাদশা এবং সম্রাট। তার দু'জন বোন যথাক্রমে রানী এবং রাজকইন্যা। নামগুলো রেখেছেন তার বাবা এবং বাবা দীর্ঘদিন থেকে পলাতক। সংসারে চাপ কমানোর জন্য সে নিজেও পলাতক। অন্যদের কথা তার বেশি মনে পড়ে না কিন্তু ছোট বোন রাজকইন্যার জন্য তার মাঝে মাঝেই পেট পোড়ে। সুন্দরবন এবং বান্দরবান ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় পুরোটাই দেখে ফেলেছে সে। সাধারণত ট্রেনের ছাদে বসে সে দেশ ভ্রমণ করে, থাকা এবং খাওয়া নিয়ে সে চিন্তা করে না। কোনো না কোনোভাবে

তার ব্যবস্থা হয়ে যায়। চব্বিশ ঘণ্টার বেশি তার কখনও না খেয়ে থাকতে হয়নি। অ আ ক– এ রকম তিন-চারটা বাংলা অক্ষর সে পড়তে পারে। ইংরেজি পড়তে পারে না কিন্তু 'নো ফুড মি হাংগ্রি টেন টাকা' এ রকম তিন-চারটা ইংরেজি বাক্য বলতে পারে।
রাজা তার পরিচয় দেওয়ার পর অন্য সবার পরিচয় রীতিমতো পানশে মনে হতে থাকে। এলোমেলো চুলের একজন কম বয়সী সুদর্শন ছেলের পরিচয়ও খুব সাদামাটাভাবে শেষ হয়ে যেত কিন্তু আলমগীর ভাই সেটাকে সাদামাটা হতে দিলেন না। ছেলেটা দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার নাম শামস। আমি দেশের বাইরে থাকি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের কথা শুনে চলে এসেছি।' শামস নামের ছেলেটা বসে যাচ্ছিল, আলমগীর ভাই তাকে বসতে দিলেন না, বললেন, 'কী হলো, আরও একটি-দুটি কথা বলো নিজের সম্পর্কে।'
'কী বলব?'
'তোমার ফিল্মের কথা বলো, অ্যাওয়ার্ডের কথা বলো, ইউনিভার্সিটির কথা বলো।'
ছেলেটা একবার কাঁধ ঝাঁকালো, রাতুল বিদেশি সিনেমায় অভিনেতাদের এ রকম কাঁধ ঝাঁকাতে দেখেছে, দেশে কখনও দেখেনি। বলল, 'আমি প্রিন্সেস নামে একটা শর্ট ফিল্ম তৈরি করেছিলাম, গ্রিন আর্থ নামে একটা ছোটখাটো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি।'
তৃষা রাতুলের দিকে ঝুঁকে বলল, 'ছেলেটা কী হ্যান্ডসাম, দেখেছিস?'
রাতুল বলল, 'হ্যান্ডসাম? তুই এর মাঝে হ্যান্ডসাম কী দেখলি। চেহারাটা কী রকম জংলি জংলি।'
'জংলি?' তৃষা রীতিমতো রেগে উঠল, 'কী ম্যানলি চেহারা। মনে হয় কচ করে খেয়ে ফেলি।'
রাতুল চোখ কপালে তুলে বলল, 'কী বললি? কচ করে খেয়ে ফেলি?'
'হ্যাঁ।' তৃষা মাথা নাড়ল, 'হ্যান্ডসাম মানুষ দেখলেই মনে হয় কামড় দিয়ে খেয়ে ফেলি।'
রাতুল বলল, 'খেয়ে ফেলি–।'
তৃষা হাত তুলে রাতুলকে থামাল, বলল, 'কথা বলিস না, শুনি হ্যান্ডসাম কী বলে?'
রাহুলও শুনল শামসও বলছে, 'আমি ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে স্কুল অব সিনেমেটিক আর্টে পিএইচডি করেছি।'
আলমগীর ভাই বললেন, 'তার মানে তুমি শামস নও, ডক্টর শামস।'
ডক্টর শামস আবার বিদেশি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকাল। আলমগীর ভাই বললেন, 'তুমি এখন কী করছ বল।'
'আমি ফ্লোরিডায় ছোট একটা ইউনিভার্সিটিতে ফ্যাকাল্টি হিসেবে জয়েন করেছি। আমার ইন্ডিপেনডেন্টভাবে কাজ করার ইচ্ছা। কাজেই শেষ পর্যন্ত মাষ্টারি করার ইচ্ছা নেই।'
তৃষা দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস বের করে বলল, 'হ্যান্ডসাম শুধু চেহারায় হ্যান্ডসাম না, দেখেছিস? দেখে মনে হয় বাচ্চা ছেলে–।'
'মোটেও বাচ্চা ছেলে মনে হয় না।' রাতুল বলল, 'বেশ বয়স।'
'অবশ্যি বাচ্চা ছেলে মনে হয়। আমাদের থেকে বড়জোর তিন-চার বছর বেশি হবে। কিন্তু পিএইচডি করে ইউনিভার্সিটির মাষ্টার। বাপরে বাপ।'
'ওই দেশে তো আর সেশন জ্যাম নাই। যদি থাকত তাহলে দেখতাম।'
তৃষা কথার উত্তর দিল না। চোখ বড় বড় করে ডক্টর রাজীবের দিকে তাকিয়ে রইল। রাতুল তৃষার দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আজকেও সকালে তৃষা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে, সে আর তৃষা হচ্ছে বন্ধু। শুধু বন্ধু!

তার জেলাস হওয়ারও অধিকার নেই!
পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পর সবাই চা খেতে উঠে গেল, তখন তৃষা গলা উঁচিয়ে বলল, 'ভলান্টিয়াররা যাবি না, এক মিনিট।'
গীতি বলল, 'কেন?'
'দায়িত্বগুলো একটু নতুন করে ভাগাভাগি করি।'
যারা ভলান্টিয়ার তারা তৃষাকে ঘিরে দাঁড়াল। তৃষা বলল, 'আমাদের রাতুল ছোট বাচ্চাদের খুব ভালো ম্যানেজ করতে পারে, তাই তাকে বাচ্চাদের দায়িত্বে দিয়ে দিই।'
রাতুল প্রবল বেগে মাথা নাড়ল, 'না, না! সর্বনাশ! আমি মোটেই বাচ্চাদের ম্যানেজ করতে পারি না।'
'আমি নিজের চোখে দেখলাম–।'
'কী দেখেছিস?'
'সব বাচ্চা তোর পিছে পিছে ঘুরছে। হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো।'
'বাচ্চাদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা এক জিনিস আর দায়িত্ব অন্য জিনিস।'
গীতি বলল, 'তোমার দায়িত্ব হচ্ছে বাচ্চাদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা।' কথা শেষ করে সে হি হি করে হাসতে থাকে।
তৃষা মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ, তাদের ব্যস্ত রাখা।'
'আমাকে অন্য কোনো দায়িত্ব দে। টয়লেট পরিষ্কার হলেও আপত্তি নাই, কিন্তু বাচ্চাকাচ্চার দায়িত্ব? অসম্ভব?'
তৃষা ভুরু কুঁচকে বলল, 'মোটেও অসম্ভব না। তাদের ব্যস্ত রাখবি। গেম খেলতে দিবি। কোনো কাজে ব্যস্ত রাখবি।'
সজল নামের ছেলেটি বলল, 'তা ছাড়া তুমি নিজে থেকে রাজার দায়িত্ব নিয়েছ। মনে আছে?'
'হ্যাঁ।'
'একজন রাজার দায়িত্ব যদি নিতে পার তাহলে এক ডজন প্রজার দায়িত্ব নিতে সমস্যা কী?'
গীতি আবার হি হি করে হাসতে থাকে। সজল তৃষার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেবিনের গেস্টদের দায়িত্বে আমার সঙ্গে আর কাউকে দিতে হবে।'
'কেন?'
'তাদের সব সময়ই কিছু না কিছু লেগেই আছে, চা দাও, কফি দাও, মশার কয়েল দাও, সিগারেট দাও, ম্যাচ দাও, খবরের কাগজ দাও।'
তৃষা বলল, 'হ্যাঁ, সকালে দেখলাম তুই ঝাড়ু নিয়ে ঘুরছিস!'
'একজনের ঘরে নাকি গোবদা একটা মাকড়সা। তিনি আবার মাকড়সাকে ভয় পান। সেটাকে মারতে হবে।'
'মেরেছিস?'
'ধুর! মাকড়সা মারা কি এত সোজা নাকি। পালিয়ে গেছে। আমি বলেছি মেরেছি।'
'আবার যখন হাজির হবে?'
'যখন হাজির হবে তখন দেখা যাবে।'
তৃষা বলল, 'ঠিক আছে, আমি থাকব তোর সঙ্গে।'
সাত নম্বর কেবিনটি সিংগেল কেবিন, জানালায় গালে হাত দিয়ে শামস বসে ছিল, তৃষা থেমে গেল, 'একা একা বসে আছেন?'
শামস হাসার চেষ্টা করল, 'কী করব? তোমরা এই জাহাজে হয় বেশি বুড়ো না হয় বেশি বাচ্চা এনেছ।'
'আমি কোন ক্যাটাগরিতে পড়েছি? বুড়া না বাচ্চা?'
'তুমি ঠিক আছ। কিন্তু তোমরা এত ব্যস্ত, ছোটাছুটি করছ, তাই ডিস্টার্ব করছি না।'
'মোটেও ব্যস্ত না। ব্যস্ত থাকার ভান করি, তা না হলে কেউ গুরুত্ব দেয় না।'
'সেটাও তো একটা কাজ।'
তৃষা সুর পাল্টাল, 'চা খাবেন?'
'খেতে পারি।'
'দুধ-চিনি?'
'দুধ নো। চিনি ইয়েস।'

আমাবাহি.কম

আমারবই.কম

'আপনি বসেন, নিয়ে আসি।'
'ছিঃ ছিঃ, তুমি কেন আনবে। আমি আনছি।' শামস বের হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।
তৃষা হাসার ভঙ্গি করল, 'আপনারা এত গুণী মানুষ, আপনাদের চা খাওয়াতে পারাই আমাদের সৌভাগ্য।'
'কেন আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ?'
'ঠাট্টা না। সত্যি কথা।'
'থাক এত সত্যি কথা বলে কাজ নেই।'
নিচে নেমে প্লাস্টিকের কাপে গরম পানি, টি ব্যাগ ও চিনি দিয়ে তৃষা বলল, 'সস্তা চা খেতে পারবেন তো?'
'আমি এমন কিছু খুঁতখুঁতে মানুষ না। গরম হলেই হলো।'
শামস চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'তুমি কী কর?'
'ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।'
'কোন সাবজেক্ট?'
'ফিজিক্স।'
শামস ভয় পাওয়ার ভান করল, 'বাবারে বাবা। ফিজিক্স-ম্যাথমেটিক্স খুব ভয় পাই।'
'ঠাট্টা করছেন?'
'কেন ঠাট্টা করব? আসলেই ম্যাথ, ফিজিক্স এগুলো ভয় পাই।'
'এ বয়সে পিএইচডি করে ফেলেছেন–'
'পিএইচডি করা সোজা। বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই। কামলার মতো পরিশ্রম করলেই অ্যাডভাইজার খুশি। আর অ্যাডভাইজার খুশি হলেই সবাই খুশি।'
'কী নিয়ে কাজ করেছিলেন?'
'মোটামুটি ইন্টারেস্টিং–'
তৃষা শামসকে থামাল, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়?'
'কী কাজ?'
'আমাদের সবার সামনে একটা প্রেজেন্টেশান দেন।'
'প্রেজেন্টেশান? এ জাহাজে? বেড়াতে এসে এ কী বিপদে পড়লাম?'
তৃষা হি হি করে হাসল। বলল, 'না না, সে রকম প্রেজেন্টেশান না। আমরা আপনার সাথে বসলাম, একটু কথা বললাম। আপনি কিছু বললেন, আমরা কিছু বললাম, এ রকম আর কী। আড্ডার মতো। কোনো কুটনামি না করে আড্ডা দেওয়া আর কী।'
শামস হাসল, বলল, 'ঠিক আছে।'
ঠিক এ রকম সময় রাতুল জাহাজের ছাদে সব বাচ্চাকে নিয়ে বসেছে। বাচ্চারা গোল হয়ে বসেছে, সামনে রাতুল গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'একটু আগে আমাকে তোমাদের ম্যানেজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'
বাচ্চারা আনন্দের মতো শব্দ করল। রাতুল বলল, 'আমি তাদের কী বলেছি জান?'
'কী?'
'আমি বলেছি আমাকে একটা চাবুক দিতে হবে।'
বাচ্চারা আবার আনন্দের মতো শব্দ করল। শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'দিয়েছে?'
'এখনও দেয় নাই, দেবে।'
শান্ত বলল, 'আমি হবো আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমাকে বলবেন কাকে চাবুক মারতে হবে, আমি মেরে দেব।'
'মনে হচ্ছে তোমাকে দিয়েই শুরু করতে হবে।'
সবাই হি হি করে হাসল। রাতুল বলল, 'আর কী বলেছে জান?'
'কী?'
'বলেছে তোমরা যদি ভালো না হয়ে থাক, শান্ত না হয়ে থাক তাহলে আমাকে সুন্দরবনে রেখে আসবে। রয়েল বেঙ্গল

টাইগারের জন্য ব্রেকফাস্ট।'
মৌটুসি বলল, 'তোমার চিন্তা করতে হবে না স্পাইডার আংকেল। আমরা সবাই খুবই ভালো হয়ে থাকব।'
'গুড।' রাতুল মাথা নেড়ে বলল, 'আমরা দেখি এ জাহাজে মজার মজার কী করতে পারি। কার কী আইডিয়া আছে বলো।'
রাজা বলল, 'নাচানাচি করতে পারি?'
রাতুল অবাক হয়ে বলল, 'নাচানাচি?'
'জে।'
'কী রকম নাচানাচি?'
'দেখাব?'
'দেখাও।'
রাজা উঠে দাঁড়াল, অন্য সবাই তাকে জায়গা করে দিল। রাজা তখন অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচা শুরু করে। পৃথিবীর কোনো নাচের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। বাচ্চারা রাতুলের মতো অবাক হলো না, তারা সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে হাততালি দিতে লাগল। রাজু জিজ্ঞেস করল, 'এই নাচ তুমি কোথায় শিখেছ?'
'একটা বিদেশিদের জাহাজে উঠেছিলাম সেইখানে।'
'লুকিয়ে?'
'জে।'
'তুমি তো দেখি মহা কামেল মানুষ!'
রাজা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, রাতুল মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যায়, রাজার আরও গুণাবলী আছে, যেগুলো সে এখনও জানে না এবং ধীরে ধীরে সেগুলো প্রকাশ পেতে থাকবে।
রাতুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমরা ট্রেজার হান্ট খেলতে পারি, ঠাণ্ডা-গরম খেলতে পারি, মৌনী বাবা খেলতে পারি, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নে খেলতে পারি, রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা খেলতে পারি–।'
টুম্পা জানতে চাইল, 'রাজাকার-মুক্তিযোদ্ধা কেমন করে খেলে?'
'চোর-পুলিশের মতো। শুধু চোর-ডাকাতের জায়গায় হবে রাজাকার, আলবদর আর পুলিশ-দারোগার জায়গায় হবে মুক্তিযোদ্ধা আর সেক্টর কমান্ডার। খুবই সোজা।'
'ট্রেজার হান্ট কীভাবে খেলে?'
যখন সময় হবে তখন বলব। এখন চলো মৌনী বাবা খেলি।
মৌটুসি জানতে চাইল, 'সেটা কেমন করে খেলে?'
'খুবই সোজা। কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। কথা না বলে কে কতক্ষণ থাকতে পারে। ঠিক আছে?'
'ঠিক আছে।' সবাই রাজি হলো এবং হঠাৎ করে সবাই চুপ করে গেল। মনে হলো ইঞ্জিনের শব্দ ছাড়া জাহাজে কোনো শব্দ নেই। অল্প ক'জন বাচ্চা এত শব্দ করে কে জানত?

রাত্রে খাওয়া শেষ হওয়ার পর হঠাৎ করে সবাই আবিষ্কার করল কারও কিছু করার নেই। দিনের বেলা যখন আলো ছিল তখন জাহাজটাকে এক রকম দেখাত, রাত্রে জাহাজটাকে কেমন জানি অপরিচিত মনে হতে থাকে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস তাই আর বাইরে কেউ নেই, কেবিনের মানুষজন কেবিনের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। অন্য সবাই ডেকে, সেখানে সবার জন্য আলাদা আলাদা বিছানা। ডেকের পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে তারপরেও ভেতরে বেশ শীত। সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে। রাতুল বাচ্চাদের সবাই শুয়ে পড়েছে কী না দেখে ফিরে যাচ্ছিল, তখন টুবলু তাকে ডাকল, 'স্পাইডার।'
'কি হলো?'
'ঘুম আসছে না।'
'চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকো, ঘুম চলে আসবে।'
'একটা গল্প বলবেন, প্লিজ?'
তখন একসঙ্গে অনেকে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল, 'হ্যাঁ, প্লিজ। একটা গল্প বলেন।'
'গল্প? এখন?'
'হ্যাঁ।'
রাতুল হাত নাড়ল, 'আমি গল্প বলতে পারি না।'
টুম্পা বলল, 'তাহলে আমি কেমন করে ঘুমাব? ঘুমানোর সময় আমার আম্মু আমাকে গল্প শোনায়।'
'তোমার আম্মুকে মিসকল দিব? ফোনে গল্প শুনিয়ে দেবেন?'
টুম্পা হাসল, 'না, না স্পাইডার। আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।'
'আমি গল্প বলতে পারি না।'
'পার পার। আমি জানি তুমি পার।'
কয়েকজন উঠে এবার রাতুলের হাত ধরে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে থাকে। রাতুল বাচ্চাদের বুঝিয়ে-সুজিয়ে চলে যেত কিন্তু ঠিক তখন সে তৃষাকে হেঁটে আসতে দেখল। তৃষা এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'
বাচ্চারা চিৎকার করে উঠল, 'গল্প! গল্প! স্পাইডার গল্প বলবে?'
তৃষা চোখ বড় বড় করে বলল, 'তাই নাকি? কিসের গল্প?'
একজন চিৎকার করে বলল, 'ভূতের।' সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই চিৎকার করতে থাকে, 'ভূতের, ভূতের।'
'তাহলে তো আমারও শুনতে হয়।'
রাতুল বলল, 'আমি মোটেও গল্প বলতে পারি না।'
মিথ্যা কথা বলবি না। তোর মতো গুলপট্টি আর কেউ মারতে পারে না। বানিয়ে বানিয়ে গল্প করার মাঝে তুই হচ্ছিস এক্সপার্ট। ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিওন।'
বাচ্চারা এবার টেনে রাতুলকে বসিয়ে দিল, কিছু বোঝার আগে সবাই তাকে ঘিরে বসে যায়। শুধু বাচ্চারা না– আশপাশে থাকা অন্যরাও চলে আসে। তৃষাও রাতুলের পাশে বসে গেল।
রাতুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে সবার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি শুনতে চাও?'
'হ্যাঁ। হ্যাঁ।'
'ভূতের গল্প?'
'হ্যাঁ।'
'ভয় পাবে না তো?'
'না। না।'
রাতুল কিছুক্ষণ সবার দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর মাথা নেড়ে বলল, 'আমি তখন মাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি–।'
গীতি তাকে থামাল, 'তুমি তোমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলবে?'
'অবশ্যই।'
'তুমি ভূত দেখেছ?'
'আমি ঘটনাটি বলি– তোমরাই বলো, এটা ভূত না অন্য কিছু?'
'তার মানে তুমি ভূতে বিশ্বাস কর?'
'তুমি কর না?'
গীতি মাথা নাড়ল, বলল, 'উঁহু।'
তৃষা বলল, 'যদি ভূত বলে কিছু থাকত তাহলে বৈজ্ঞানিকরা এত দিনে সেটাকে ধরে একটা বোতলে ভরে অ্যাটমিক ডিসচার্জ করে বের করে ফেলত ভূত কী দিয়ে তৈরি!'
গীতি মাথা নাড়ল, 'জেনেটিক কোডিং বের করে ফ্যামিলি হিস্ট্রিও বের করে ফেলত।'
বাচ্চারা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা শুনতে চাইছিল না, তারা রাতুলকে তাড়া দিল, 'বলো, গল্প বলো।'
রাতুল আবার শুরু করল, 'আমি তখন সান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। হলে জায়গা পাচ্ছি না তাই–।'
এরপর রাতুল কীভাবে হলে জায়গা পেল এবং অত্যন্ত বিচিত্র একজন রুমমেট তাকে প্ল্যানচেট করা শেখাল এবং কীভাবে এক অমাবস্যার রাতে মৃত মানুষের আত্মা আনতে গিয়ে ভয়াবহ বিপদের মাঝে পড়েছিল তার একটা অত্যন্ত নিখুঁত বর্ণনা

আমারবই.কম

আশিয়ান শীতলছায়া

আলো ঘরের ভেতরে পড়েছে, সেই আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘরের মেঝেতে একটা কিছু শুয়ে আছে। চাদর দিয়ে পুরোটা ঢাকা– চাদরের নিচে কী আছে জানি না কিন্তু সেটা নড়ছে। নড়া না বলে বলা উচিত কিলবিল করছে। চাদরে ছোপ ছোপ রক্ত। সেখান থেকে রক্তের একটা ধারা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।
আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। তারপর এক পা এক পা করে পিছিয়ে এলাম। পায়ের নিচে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। ঘর থেকে বের হয়ে আমি একটা দৌড় দেব তখন হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি এটা কী করছি? আমি তো ভীতু মানুষ না। কিন্তু আজ আমি জন্মের মতো ভীতু হয়ে যাব। হয়তো এখানে একজন মানুষের সাহায্য দরকার। আমি তাকে সাহায্য না করে পালিয়ে যাচ্ছি। এই কাজটা তো ঠিক হচ্ছে না। তখন আমি আবার ঘরের ভেতর এসে ঢুকলাম। নিচু হয়ে চাদরটা ধরেছি, যখন একটা টান দেব ঠিক তখন কে যেন প্রচণ্ড জোরে একটা ধমক দিল।

'এই ছেলে– কী করছ তুমি?'

আমি চমকে উঠে মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। ঘরের দরজায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, আবছা অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, শুধু বোঝা যাচ্ছে মানুষটার মুখে কুচকুচে কালো লম্বা দাড়ি।
'কী করছ এখানে? কী করছ?'
এতক্ষণ আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে সাহস দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলাম– হঠাৎ করে আমার পুরো সাহস উবে গেল। ভয়ে আতঙ্কে আমি থর থর করে কাঁপতে শুরু করেছি। আমি বললাম, 'আমার খুব ভয় করছে।'
মানুষটা বলল, 'ভয় তো করবেই, তুমি জান এটা কী?'
'না, জানি না। এটা কী?'
'সেটা তোমার জানার দরকার নেই। তুমি এ মুহূর্তে বের হয়ে আস। বের হয়ে আস।'
আমি তখন কোনো মতে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আবার হঠাৎ করে মনে হলো আমার ডানে-বামে অনেক ছায়ামূর্তির মতো, মনে হয় আছে আবার তাকালে মনে হয় নাই। তাদের নিঃশ্বাসের এক ধরনের শব্দ শোনা যায়, অনেক লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস। আমি মানুষটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?'
মানুষটা বলল, 'তোমার জানার দরকার নেই। তুমি হাঁট। সোজা আমার পিছনে পিছনে হাঁট।'
মানুষটা তখন দুই পা হেঁটে গেল। প্রচণ্ড ভয়ে আমি তখন প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছি। ভাঙা গলায় বললাম, 'আমাকে নিয়ে যান প্লিজ। আমাকে রেখে যাবেন না। আমার খুব ভয় করছে।'
'তুমি আমার সাথে আস। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'
মানুষটা তখন হাঁটতে থাকে। আমি পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকি। আর তখন আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম–"
এইটুকু বলে রাতুল একটু থামল। বাচ্চাগুলো ফ্যাকাসে মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখলে?'
'দেখলাম সামনে যে মানুষটা যাচ্ছে তার পা দুটো মানুষের পায়ের মতো না। ঘোড়ার পায়ের মতো। পায়ে খুড়, পুরো পা কুচকুচে কালো লোমে ঢাকা।
করিডোরে সেই খুড় দিয়ে খুট খুট শব্দ করে হেঁটে যাচ্ছে।
আমি তখন কী করেছিলাম মনে নেই। মনে হয় রেলিংয়ের উপর দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়েছি। সেখান থেকে ছুটে গেটের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি নিজে অবশ্য কিছুই জানি না। আমার যখন জ্ঞান হয়েছে তখন আমি হাসপাতালে। আমার পাশে হলের হাউস টিউটর, আমার এক বন্ধু।'

রাতুল হাত নেড়ে বলল, 'পরে শুনেছি আমি যেই রুমটাতে ঢুকেছিলাম সেখানে কেউ থাকে না। একটা ছেলে সেখানে সুইসাইড করেছিল। যাই হোক সেটা অন্য গল্প। ভূতের গল্প এটুকুই।'
মৌটুসি শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভিজিয়ে বলল, 'তোমার অনেক সাহস!'
রাতুল উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আমার মোটেও বেশি সাহস নেই। আসলে আমি একটু বোকা টাইপের, সেটাই হচ্ছে আমার সমস্যা। না বুঝে আমি বিপদের মাঝে পড়ে যাই।'
গীতি বলল, 'আজ রাতে ঘুমাতে পারব না।'
তৃষা উঠে দাঁড়াল, বলল, 'দিলি তো ভয় দেখিয়ে। এখন আমার পুরো জাহাজ চক্কর দেবার কথা– ভয় করছে।'
রাতুল হাসল, বলল, 'ভয় কিসের। আয় আমি তোর সাথে যাই।'
'চল।'
ডেকে সবাই শুয়ে পড়েছে। তাদের মাঝে দিয়ে তৃষা আর রাতুল হেঁটে যায়। তৃষা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা রাতুল। তুই সত্যি করে বল দেখি– আসলেই হলে তোর ঐ ঘটনাটা ঘটেছিল?'
রাতুল হেসে ফেলল, বলল, 'তোর মাথা খারাপ হয়েছে? এরকম ঘটনা ঘটা সম্ভব?'
তৃষা চোখ বড় বড় করে বলল, 'তার মানে তুই বসে বসে এরকম চাপাবাজি করে এসেছিস? মিথ্যা কথা বলে এসেছিস?'
'আমি মোটেও মিথ্যা কথা বলিনি। চাপাবাজি করিনি। আমি গল্প বলেছি। ভূতের গল্প মানুষ শুনে ভয় পাওয়ার জন্যে– ভয়টা অনেক অনেক বেশি হয় যদি সেটা পার্সোনাল গল্প হয়, সত্যি গল্প হয়। তাই একটা ভাব সৃষ্টি করতে হয় যেন গল্পটা সত্যি।'
'তাই বলে এভাবে?'
'কেন সমস্যা কী?'
'সবাইকে এতো ভয় দেখিয়ে দিলি?'
'শোন। ভূত বলে কিছু নেই কিন্তু ভূতের গল্প আছে। আমাদের মত সৃজনশীল মানুষেরা যদি বানিয়ে বানিয়ে এই গল্প না বানায় তাহলে ভূতের গল্প তৈরি হবে কেমন করে?'
তৃষা হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দুজনে হেঁটে যখন রেলিংয়ের কাছে দাঁড়িয়েছে তখন শুনতে পেল কোথায় যেন কে গান গাইছে। ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে সেই গানের সুর ভেসে আসছে। দুজনে গানের শব্দ খুঁজে খুঁজে নিচে হাজির হলো, এক কোনায় কিছু মানুষের জটলা, মাঝখানে একজন খালাসী হারমোনিয়াম দিয়ে গান গাইছে, পাশে একজন একটা অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি উল্টো করে তাল দিচ্ছে। তাকে ঘিরে জাহাজের অন্য মানুষজন।
তৃষা বলল, 'কী সুন্দর গলা দেখেছিস?'
'হ্যাঁ। হারমোনিয়াম দিয়ে গাইছে তার মানে লোকটা রীতিমত চর্চা করে।'
'আর একটু শুনে যাই।'
দুজনে এগিয়ে যেতেই সবাই তাদের বসার জন্যে জায়গা করে দিল। যে গাইছিল সে থেমে গেল, তৃষা বলল, 'থামলেন কেন? প্লিজ গাইতে থাকেন।'

লোকটা আবার গাইতে শুরু করল, প্রিয়াকে দূর দ্বীপে ফেলে রেখে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নদী পাড়ি দেয়া সংক্রান্ত একটি গান। গান শেষ হবার পর শুনতে পেল, কে যেন বলছে, 'কোথায় তুমি কী খুঁজে পাবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। কে জানত এখানে এরকম একজন গায়ক পেয়ে যাব।'
তৃষা আর রাতুল ঘুরে তাকাল, নাট্যকার বাতিউল্লাহ কাছাকাছি বসে গান শুনছেন। তৃষা

আশিয়ান শীতলছায়া

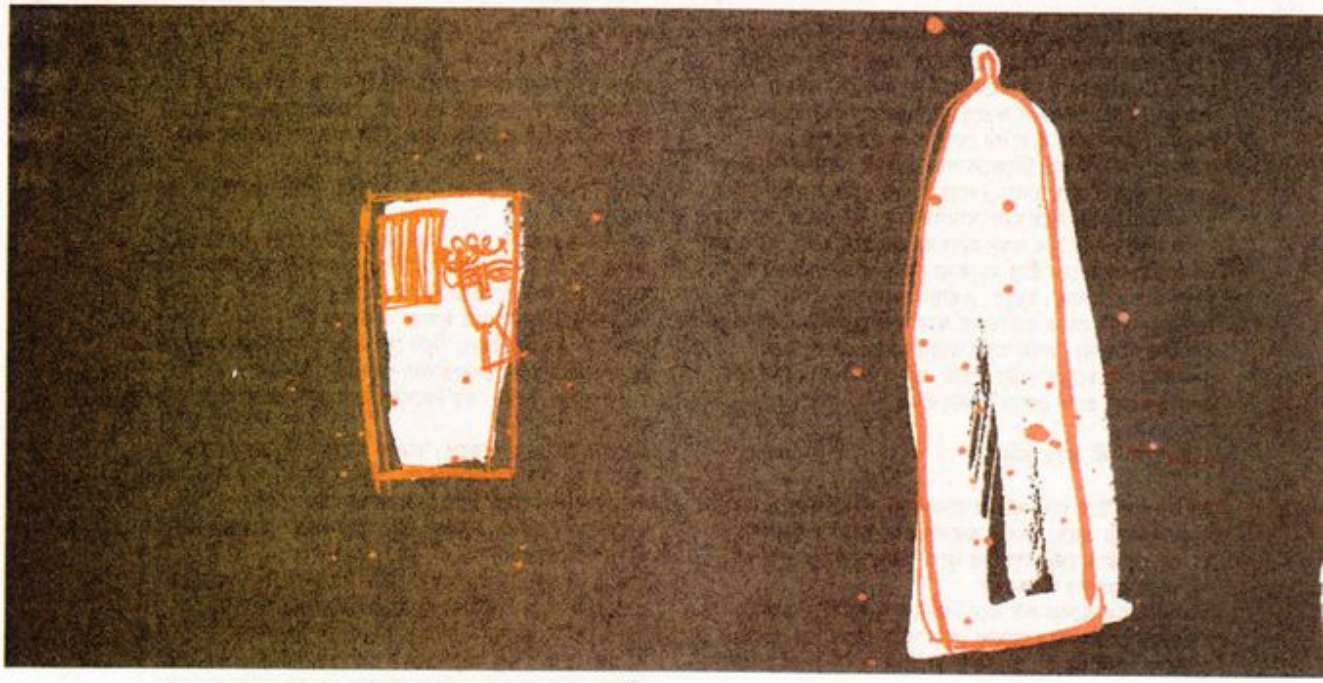

দিল। গল্প শুনতে গিয়ে সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল এবং সবাই চুপ করে রইল এবং বেশ খানিকক্ষণ পর তৃষা বলল, 'গুলপট্টি। চাপাবাজি। পরিষ্কার চাপাবাজি– এটা হতেই পারে না।'

কিন্তু ততক্ষণে একটা ভৌতিক পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে এবং সজল নামে ভলান্টিয়ারদের একজন তার বড় বোনের অভিজ্ঞতাটি সবিস্তারে বর্ণনা করল। এরপর গাড়ির আরেকটা ছোট ঘটনা তারপর আবার রাতুলের গল্প, পরপর তিনটি। যে গল্পটা শুনে সবার হাত-পা শরীরের ভেতর সেঁধিয়ে গেল সেটা এ রকম–

"দুই বছর আগের ঘটনা। রোজার ঈদের ঠিক আগে আগে আমার নানার হার্ট অ্যাটাক হলো। সময়মতো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা সিপিআর করে কোনোমতে নানাকে বাঁচিয়ে তুললেন। এনজিওগ্রাম করে দেখা গেল হার্টে পাঁচটা ব্লক, সার্জারি করতে হবে। সবাই মিলে ঠিক করল, নানাকে অপারেশন করার জন্য ইন্ডিয়া নিয়ে যাবে। নানা ভীতু মানুষ তাই সাথে যাবেন আমার মা। আমার মা একা একা কোথাও যান না তাই বাবাকে সাথে যেতে হবে। বাবার ছুটি নিয়ে ঝামেলা তাই ঠিক হলো ঈদের ছুটিতে যাওয়া হবে। আমার আর একটি মাত্র বোন, তার বিয়ে হয়ে গেছে, হাজব্যান্ড-ওয়াইফ দু'জনেই ডাক্তার। দুটি বাচ্চাকে নিয়ে সিলেট থাকেন। তাই ঈদের আগে আমি আবিষ্কার করলাম, ঈদের ছুটিতে আমার যাওয়ার জায়গা নেই– ঠিক করলাম হলেই থেকে যাব। এটা এমন কিছু ব্যাপার না। পরীক্ষার আগে অনেকেই বাড়িতে যায় না, হলে থেকে যায়। তা ছাড়া কিছু ছাত্র আছে এরা পরীক্ষা থাকুক না থাকুক, ছুটিছাটা থাকুক না থাকুক সব সময়ই হলে থাকে।

রোজা যতই শেষ হতে থাকল, হল খালি হতে থাকল। ২৭ রোজার পর মনে হলো হল বুঝি একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। আমি যখন হল থেকে বের হই কিংবা ঢুকি তখন দারোয়ান জিজ্ঞেস করে 'স্যার, বাড়ি যাবেন না?' আমি যখন মাথা নেড়ে বলি 'নাহ!' তখন দারোয়ানের মুখটা ভোঁতা হয়ে যায়। হলে কেউ না থাকলে সে গেটে তালা মেরে চলে যেতে পারে। কিন্তু একজনও যদি ভেতরে থাকে তাহলেই তার গেটে ডিউটি করতে হয়। তাই তার মেজাজ খারাপ হতেই পারে।

"যা-ই হোক, ঈদের আগে আগে ঢাকা শহর ফাঁকা হতে শুরু করে। কিন্তু দোকানপাটে মানুষের ভিড়। আমার কোনো কাজকর্ম নেই, তাই শপিং মলে ঘুরে বেড়িয়ে রাতে কোনো হোটেলে খেয়ে হলে ফিরে আসি। ঢাকা শহরে আমার যে বন্ধুবান্ধবরা থাকে তারা আমাকে তাদের বাসায় থাকার জন্য বলেছে। কিন্তু ঈদ একটা পারিবারিক উৎসব, ফ্যামিলির সবাই একসঙ্গে থেকে ঈদ করবে, আমি বাইরের একজন মানুষ অন্যের ফ্যামিলিতে ঢুকে যাই কেমন করে?

"যা-ই হোক ঈদের দিনটা ভালোই কাটল, ঈদের পরদিন ঢাকা শহরে আমার যাওয়ার জায়গা নেই। বিকেল পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যার আগে আগে হলে ফিরে এসেছি। গেটে কেউ নেই, অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করে শেষ পর্যন্ত দারোয়ানকে পাওয়া গেল। সে এসে গোমড়া মুখে গেট খুলে দিল। আমি এসে রুমে ঢুকে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে গেলাম।

"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিচিত্র স্বপ্ন দেখছি– অসময়ে ঘুমালে যা হয়। হঠাৎ করে আমার ঘুম ভাঙল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে, আমি কোথায়। যখন সবকিছু মনে পড়ল তখন আমি উঠে বসেছি, প্রথম আমার যে কথাটা মনে হলো, সেটা হচ্ছে চারদিক আশ্চর্য রকম নীরব। আমি এতদিন এখানে আছি কখনও মনে হয়নি এ রকম নিঃশব্দ একটা রাত দেখেছি। আমি বিছানা থেকে উঠে ঘড়ি দেখলাম, রাত এগারোটা। রাতে বাইরে গিয়ে খেয়ে আসার কথা

ছিল, এত রাতে আর কোথায় যাব? ঈদ উপলক্ষে গত দু'দিনে এত খাওয়া হয়েছে, সপ্তাহখানেক না খেলেও কিছু হওয়ার কথা নয়। আমি ঠিক করলাম দুই গ্লাস পানি খেয়ে ঘুমিয়ে যাব।

"বোতল থেকে যখন গ্লাসে পানি ঢালছি ঠিক তখন শুনতে পেলাম কে যেন বারান্দা দিয়ে হেঁটে আসছে। আমি বেশ অবাক হলাম। কারণ আমি জানি হলে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। পায়ের শব্দ যখন ঠিক আমার রুমের সামনে এসেছে আমি তখন দরজা খুলে বের হলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। বারান্দার এ মাথা থেকে ওই মাথা পুরোপুরি ফাঁকা। আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। আমার মনে হলো বাইরে যেন কনকনে ঠাণ্ডা। আমার সারা শরীরে কেমন যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। হঠাৎ করে আমার মাঝে প্রচণ্ড একটা আতঙ্ক এসে ভর করল, আমি ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

"সেটা অত্যন্ত বিস্ময়কর একটা অনুভূতি, মনে হতে থাকে আশপাশে যেন কোনো একটা কিছু আছে, মনে হতে থাকে যেন আমাকে কিছু একটা দেখছে, মনে হতে থাকে কেউ যেন পেছন থেকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার মনে হতে থাকে কেউ যেন খুব কাছে থেকে ফিস ফিস করে কথা বলছে। মনে হয় কেউ যেন নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বিছানায় বসেছি। গ্লাসে পানি ঢেলে রেখেছিলাম, সেটা ঢক ঢক করে খেয়ে নিলাম। কী করব বুঝতে পারছি না। ঠিক তখন পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এবারে একজনের পায়ের শব্দ নয় বেশ কয়েকজনের। শুধু পায়ের শব্দ নয়, এবার গলার স্বরও শুনতে পেলাম। বেশ কয়েকজন কথা বলতে বলতে আসছে। আমার তখন বুকের মাঝে সাহস ফিরে এল। গেটের দারোয়ান নিশ্চয়ই অন্য কয়েকজনকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে দেখছে। আমি ঠিক করলাম একা একা আর থেকে কাজ নেই, আমি দারোয়ানের সঙ্গে বের হয়ে যাব।

"যখন পায়ের শব্দ আর গলার আওয়াজ আমার দরজার সামনে এসেছে আমি তখন দরজা খুলেছি। বাইরে কেউ নেই। শুধু যে কেউ নেই তা নয়। একটা শব্দও নেই। পুরোপুরি নিঃশব্দ। আমি আতঙ্কে একেবারে জমে গেলাম। অনেক কষ্ট করে আমি তখন নিজেকে শান্ত করেছি। নিজেকে বোঝালাম, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ হলে এসেছে। তারা আমার ঘরের সামনে দিয়ে হেঁটে আমার পাশের কোনো একটা রুমে ঢুকে গেছে। আমার আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। নিজেকে নিশ্চিত করার জন্য আমি বারান্দা দিয়ে কয়েক পা হেঁটে গেলাম; বারান্দায় টিমটিমে একটা লাইটের আবছা আলোতে হলের ঘরের দরজাগুলো লক্ষ্য করলাম। কোনো একটা ঘরে নিশ্চয়ই তালা খোলা। ভেতরে নিশ্চয়ই মানুষগুলো আছে।

"আমি ঠিক তখন আবার নিচু গলার মানুষের কথা শুনতে পেলাম। আমার অনুমান সত্যি। সামনে কোনো একটা ঘর থেকে গলার শব্দ আসছে। আমি কয়েক পা এগিয়ে গেলাম এবং হঠাৎ করে পুরোপুরি জমে গেলাম। সামনে সত্যি সত্যি একটা ঘরের দরজায় তালা নেই। দরজার নিচ দিয়ে রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে বের হয়ে আসছে।

"আমি ঘরের সামনে দাঁড়ালাম আর ভেতরে হঠাৎ করে গলায় শব্দ থেমে গেল। আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মাথার ভিতরে সব কিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে, পরিষ্কার করে চিন্তা করতে পারছি না। ছুটে পালিয়ে যাবার কথা কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘরের দরজা ধাক্কা দিলাম, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে আবছা অন্ধকার, বারান্দার

জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমাতে যাননি এখনো?'
'ঘুম?' বাতিউল্লাহ এমনভাবে কথা বললেন যেন ঘুম অত্যন্ত অশ্লীল একটা শব্দ।
'হ্যাঁ', তৃষা বলল, 'ঘুমাবেন না।'
বাতিউল্লাহ মাথা নাড়লেন, 'আমার ঘুম আসে না।'
'ঘুম আসে না?'
'নাহ। ইনসোমনিয়া। ঘুমের ওষুধ খেলে একটু ঝিমুনির মত হয়, এর বেশি কিছু না।' বাতিউল্লাহ পকেট থেকে এক গাদা ওষুধ বের করে দেখালেন, 'এই দেখ। ঘুমের ওষুধ।' একটা ট্যাবলেট দেখিয়ে বললেন, 'এই একটা ট্যাবলেট খেলে ঘোড়া ঘুমিয়ে যাবে। আমি দুইটা খাই তারপরেও ঘুম আসে না।'
রাতুল জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এই ওষুধ পকেটে নিয়ে ঘুরেন?'
'হ্যাঁ। সব ওষুধ আছে আমার কাছে। পকেটে থাকে। পকেটে ওষুধ না থাকলে কেমন জানি অসহায় অসহায় লাগে। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে ওষুধগুলো নাড়াচাড়া করি তখন ভালো লাগে।' কথা শেষ করে বাতিউল্লাহ হা হা করে হাসলেন।
রাতুল আর তৃষা একটু অবাক হয়ে বাতিউল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকে। গায়ক ঠিক এই সময় আরেকটা গান শুরু করল তাই কথা আপাতত বন্ধ হয়ে গেল। সবই মিলে গুটিশুটি মেরে গান শুনতে থাকে।

২.

'আমার মনে হয় তোমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাব।' রাতুল ভুরু কুঁচকে শামসের দিকে তাকিয়ে রইল, রাতুল টের পেল কথাটা শুনে তার একটু মেজাজ গরম হয়েছে। শামস যদি বলত 'আমাদের' সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাব, তাহলে তার মেজাজ গরম হত না। শামস নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে, সে একদিকে আর তারা অন্য সবাই একদিকে। রাতুলের মেজাজটা একটু বেশি খারাপ হলো কারণ শামস তাদেরকে তুমি তুমি করে বলছে, সে তো এমন কিছু বয়স্ক মানুষ নয়, তাহলে তাদেরকে তুমি করে কেন বলবে? এখন রাতুলও কি শামসকে তুমি করে বলবে? জিজ্ঞেস করবে, কেন 'তুমি' মনে কর আমাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে? রাতুল অবশ্য কিছু জিজ্ঞেস করল না শুধু ভুরু কুঁচকে শামসের দিকে তাকিয়ে রইল।
শামস বলল, 'আমি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের দেখেছি। তারা খারাপ না।'
রাতুলের আবার মেজাজ খারাপ হলো। 'খারাপ না' কথাটার মাঝে এক ধরনের উন্নাসিকতা আছে, কথাটা খুব সুন্দর হত যদি শামস বলত, 'আমি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের দেখেছি। তারা চমৎকার–' কিন্তু শামস সেটা বলছে না। শামস বলল, 'আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা তাদের বিষয়বস্তু মোটামুটি জানে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল এরেনাতে তারা ভালো করে না– তার কারণ তারা টিমিড, তারা যথেষ্ট পরিমাণ এগ্রেসিভ না, তারা আউটস্পোকেন না।'
রাতুলের যেরকম মেজাজ গরম হচ্ছে অন্যদের মোটেও সেরকম মেজাজ গরম হচ্ছে না। তারা শামসের কথার সাথে সাথে মাথা নাড়ছে, রাতুল চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ্য করল তৃষার চোখে এক ধরনের মুগ্ধ বিস্ময়, আর সেটা দেখে সে নিজের ভিতরে কেমন জানি এক ধরনের জ্বালা অনুভব করে।
শামস বলল, 'গ্লোবালাইজেশনের কারণে এখন আমাদের সবার সাথে কমপিট করতে হবে। টেকনোলজি পৃথিবীটাকে ছোট করে ফেলেছে। এখন আমরা নিজেদের সাথে কমপিট করি না, সারা পৃথিবীর সাথে কমপিট করি। অন্যেরা এগিয়ে যাচ্ছে, তোমরা পিছিয়ে পড়ছ।'
একজন গদগদ গলায় বলল, 'আমাদের কী করা উচিত শামস ভাই?'
'কী করতে হবে সেটা তো দিনের আলোর মত স্পষ্ট। আমাদেরকে গ্লোবাল সিটিজেন হতে হবে, গ্লোবালি সবার সাথে ফাইট করতে হবে। আমাদের কমপিট করতে হবে। সেটা করার জন্যে আমাদের প্রতিযোগিতা করা শিখতে হবে– সব ফিল্ডে কম্পিটিশানের আয়োজন করতে হবে–'
রাতুল বলল, 'আমি আপনার সাথে একমত নই।'
সবাই চমকে উঠল আর শামসকে দেখে মনে হলো কেউ তার নাকে একটা ঘুষি মেরেছে। সরু চোখে রাতুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কী বললে?'
'আমি বলেছি আমি আপনার সাথে একমত নই।'
শামসের ফর্সা মুখটা কেমন যেন লাল হয়ে উঠল; সে চিন্তাও করতে পারেনি কেউ তার কথার বিরোধিতা করতে পারে। জিজ্ঞেস করল, 'কোন বিষয়টাতে একমত না?'
'কম্পিটিশানের ব্যাপারে। আমি কম্পিটিশানের বিরুদ্ধে।'
'কম্পিটিশানের বিরুদ্ধে?'
'হ্যাঁ, সত্যিকার জীবনে আমরা একের সাথে অন্যে কম্পিটিশান করি না, আমরা সবাই মিলে কাজ করি, কো অপারেশান করি। প্রতিযোগিতা দিয়ে পৃথিবীর কোনো বড় কাজ হয় নাই, সব বড় কাজ হয়েছে সবার সহযোগিতা দিয়ে, তাহলে আমি কেন সবাইকে প্রতিযোগিতা করতে শেখাব? কেন একে অন্যকে কনুই দিয়ে ঠেলে এগিয়ে যাবে?'
রাতুলের কথাটা এত চাচাছোলা আর এতো তীক্ষ্ণ যে শামস থতমত খেয়ে গেল, চট করে উত্তর দেবার মত কিছু খুঁজে পেল না। সে রাতুলের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করছিল কিন্তু তার কপাল ভাল ঠিক তখন জাহাজের বাচ্চাগুলো ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে এল। একজনের হাতে একটা কাগজ সেটা সবাই মিলে দেখছে। তারা সবার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় তারপর ছুটতে ছুটতে চলে যেতে শুরু করে। তৃষা বলল, 'কী দেখছিস?'
মৌটুসি বলল, 'তোমাদের কারো জোড়া ভুরু আছে কি না।'
'জোড়া ভুরু?'
'হ্যাঁ'
'জোড়া ভুরু থাকলে কী হবে?'
'আমাদের গুপ্তধনের পরের ক্লু তার কাছে–'
'গুপ্তধন? কিসের গুপ্তধন?'
বাচ্চারা খুব ব্যস্ত, তাদের তৃষার সাথে কথা বলার সময় নেই। মৌটুসি ছুটতে ছুটতে বলল, 'পরে বলব।'
তৃষা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রাতুলের দিকে তাকাল, 'কী করছে ওরা?'
রাতুল হাসল, বলল, 'একটা খেলা। জাহাজটা যতক্ষণ চলে বাচ্চারা ততক্ষণ বাহিরে তাকিয়ে সময় কাটাতে পারে। দুই পাশে সুন্দরবন শুরু হয়ে গেছে– কখনো গাছে বানর দেখছে, কখনো হরিণ, কখনো কুমির। সবাই রয়েল বেঙ্গল টাইগার খুঁজছে। কিন্তু যখন জাহাজটা থেমেছে তখন তাদের সময় আর কাটে না। অধৈর্য হয়ে গেছে।'
তৃষা বলল, 'এখান থেকে দুইজন আনসার তুলবে। রাইফেল ওয়ালা আনসার। সেই জন্যে থেমেছি।'
রাতুল বলল, 'জানি।'
'ট্রলার করে ভিতরে যেতে হয়েছে সেই জন্যে সময় লাগছে।'
'সেটা জানি, বাচ্চারাও জানে। জেনেও তারা অধৈর্য হয়ে যায়। সেই জন্যে তারা বাচ্চা আর আমরা বড় মানুষ।'
গীতি বলল, 'এখন তো তাদের মোটেও অধৈর্য

মনে হলো না, সবাই দেখি খুবই উত্তেজিত। কী খেলা খেলছে?'
'ট্রেজার হান্ট। গুপ্তধন খুঁজে বের করা। জাহাজের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের কাছে আমি ক্লু লুকিয়ে রেখেছি। একটা ক্লুয়ের মাঝে পরের ক্লুটা সম্পর্কে লেখা থাকে। মাথা খাটিয়ে বের করতে হয়। মোট বারোটা আছে, এর মাঝে সাত নম্বরে পৌঁছে গেছে।'
'গুপ্তধনটা কী?'
'এই জাহাজে গুপ্তধন আর কী পাব? তাই গুপ্তধনটা হচ্ছে একটা অঙ্গীকার।'
'কী অঙ্গীকার?'
'আজ রাতে ডিসকো নাইট হবে।'
'ডিসকো নাইট?'
'হ্যাঁ। সবাই মিলে নাচানাচি। এখন নাচানাচি করার জন্যে কিছু ধুমধাড়াক্কা গান দরকার। চেষ্টা করছি ডাউনলোড করতে। নেটওয়ার্ক এতো দুর্বল–'
'আছে এই তো বেশি।'
রাতুল মাথা নাড়াল, বলল, 'হ্যাঁ সমুদ্রের দিকে গেলে নাকি নেটওয়ার্ক থাকে না। এখানে আছে।'
শামস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাতুলের দিকে তাকিয়ে ছিল, যেখানে সে থাকবে সেখানে সে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়, সে মোটামুটি এটাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাই রাতুলের সাথে কথাবার্তাটাতে সে একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া তৃষা তার সাথে ঠিক করেছে সে সবার সাথে কথা বলবে, অন্য কেউ নয়। শামস তাই সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার কথাটা যে সত্যি তোমরা দেখেছ?'
তৃষা জিজ্ঞেস করল, 'কোন কথাটা?'
'এই যে এদেশের ইয়াং জেনারেশান– আই মিন তোমরা– তোমাদের মাঝে সেন্স অফ কম্পিটিশান নেই।' শামস রাতুলকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে এই ছেলেটি কম্পিটিশানকে বিশ্বাসই করে না। ইনক্রেডিবল।'
শামসের কথার মাঝে এক ধরনের তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল, রাতুলের গা জ্বালা করে উঠল কিন্তু সে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, 'আমি কেন কম্পিটিশান পছন্দ করি না তার একটা যুক্তি দেখিয়েছি। আপনিও আপনার যুক্তি দেখান?'
'যুক্তি? যে জিনিসটা অভিয়াস, যে জিনিসটা স্পষ্ট তার জন্যে যুক্তি দিতে হয়? সারা পৃথিবীটা চলছে কম্পিটিশানের উপর। ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট হয়, ফুটবল হয়, অলিম্পিক হয়। ম্যাথ অলিম্পিয়াড হয়, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড হয়, আমেরিকান আইডল হয়– সব হচ্ছে কম্পিটিশান।'
'অবশ্যই হয়। আপনি যে কয়টা কম্পিটিশানের কথা বলেছেন তাতে কতোজন মানুষ অংশ নেয়? কয়েক হাজার? পৃথিবীতে ছয় বিলিওন মানুষ– তারা কোথায় যাবে? তারা কোন কম্পিটিশানে অংশ নেব?'
শামস এবারে কেমন যেন ক্রুদ্ধ চোখে রাতুলের দিকে তাকিয়ে থাকে।
'তার মানে তুমি কী বলতে চাইছ?'
'আমি বিশেষ কিছু বলতে চাইছি না! আপনার কথা সত্যি– পৃথিবীটা চলছে কম্পিটিশান দিয়ে, কিন্তু একটা চালু থাকলেই সেটা ভালো কে বলেছে? পৃথিবীতে অনেক খারাপ জিনিস চলছে। যেমন মনে করেন–'
তৃষা রাতুলকে থামাল, বলল, 'তুই থাম দেখি রাতুল। তোর সব যুক্তি হচ্ছে কুযুক্তি। কেউ কিছু বললেই তুই বাগড়া দিস।'
'বাগড়া? আমি বাগড়া দিচ্ছি?'
'অবশ্যই বাগড়া দিচ্ছিস। আমরা শামস ভাইয়ের কথা শুনতে বসেছি। তোর কথা শুনতে বসিনি। তোর কথা আমরা দিনরাত শুনি।'
রাতুল কেমন যেন আহত অনুভব করে, থতমত খেয়ে বলল, 'সরি! আমি আসলে বুঝতে পারিনি। তুই বললি আড্ডার মতো হবে– যখন আড্ডা দেয় তখন তো শুধু একজন কথা বলে না– সবাই বলে।'
'হ্যাঁ আমি বলেছিলাম আড্ডার মত, তার মানে না–'
তৃষা কথা শেষ করতে পারল না, হঠাৎ করে সবাই ওপর থেকে নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেল। কেউ একজন কোনো একটা কিছু নিয়ে চিৎকার করছে। কী ঘটছে দেখার জন্যে সবাই তখন ওপরে ছুটে এল।
দোতলার একটা কেবিনের সামনে গিয়ে দেখে টেলিভিশনের নায়িকা শারমিন রাজাকে তার চুলের মুঠি দিয়ে ধরে রেখে তীক্ষ্ণ গলায় গালাগাল করছে। তৃষা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'
'এই হারামজাদা চোর আমার কেবিনে ঢুকে আমার ব্ল্যাকবেরি মোবাইল চুরি করেছে।'
'চুরি করেছে?'
'হ্যাঁ' কথা শেষ করে শারমিন রাজার চুল ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে গালে একটা চড় বসিয়ে দিল– 'দে হারামজাদা আমার ব্ল্যাকবেরি।'
রাতুল একটু হতবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, কী মিষ্টি আর কী মায়াভরা চেহারা মেয়েটির, তার জন্যে একটা ছোট বাচ্চাকে মারার দৃশ্যটি কী বেমানান, মুখে 'হারামজাদা' শব্দটি কী অশ্লীল শোনায়, গা কাঁটা দিয়ে উঠে। রাতুল এগিয়ে গিয়ে রাজাকে শারমিনের হাত থেকে ছুটিয়ে আনল, হাত ধরে বলল, 'রাজা। তুমি এই ম্যাডামের ঘরে ঢুকেছ?'
'জে।' রাজা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কিন্তু আমি চুরি করি নাই। কসম খোদা।'
'তুমি কেন এই ম্যাডামের ঘরে ঢুকেছ?'
'বাক্সের ভিতরে বাক্স আছে কি না দেখতে গিয়েছিলাম।'
বাক্সের ভিতর বাক্স বিষয়টা কী কেউ বুঝতে পারল না, শুধু রাতুল বুঝতে পারল। বাচ্চাদের ব্যস্ত রাখার জন্যে সে গুপ্তধন খোঁজার যে খেলাটি শুরু করিয়ে দিয়েছে সেখানে এক সময় বাক্সের ভিতর বাক্স খোঁজার কথা। রাজা এবং অন্য সব বাচ্চা সারা জাহাজে বাক্সের ভিতর বাক্স খুঁজছে, সে জন্যে নিশ্চয়ই শারমিনের কেবিনে ঢুকেছে। অন্য কোনো বাচ্চা ঢুকলে শারমিন এতো খেপে উঠত না কিন্তু রাজা ঢুকতে যাওয়াটা অন্য ব্যাপার। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয়টি হচ্ছে চুরির অভিযোগ।
রাজা এতক্ষণে ফ্যাস ফ্যাস করে কাঁদতে শুরু করেছে, কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বিশ্বাস করেন আমি কিছু চুরি করি নাই।'
রাতুল শারমিনের দিকে তাকাল, 'আপনি শিউর ব্ল্যাকবেরি চুরি গেছে?'
'হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিউর।' শারমিন থমথমে মুখে বলল, 'তাহা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে ব্ল্যাকবেরিটা টেবিলে রেখে শুয়েছি। ঘরের ভিতর শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি এই হারামজাদা ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। একটু পরে যখন টেবিলের ওপর তাকিয়েছি তখন দেখি ব্ল্যাকবেরিটা নাই।'
রাতুল বলল, 'হয়তো অন্য কোথাও রেখেছেন।'
শারমিন তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'না রাখি নাই। আমি এই টেবিলের ওপর রেখেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে।'
কেবিনের সামনে একটা জটলার মত হয়েছে, পিছন থেকে কে যেন বলল, 'আমি আগেই বলেছিলাম, এই ছেলেটিকে সাথে নেয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল না।'
রাতুল মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, কবি শাহরিয়ার মতিন মুখ সূচালো করে রাতুলের দিকে তাকিয়ে আছেন। শারমিন চিলের মত তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করে বলল, 'আমার এখানে আসাই ঠিক হয়নি। আমার শিডিউল চেঞ্জ করে এসেছি– এখানে দেখি সব চোর ছ্যাচড়।'
তৃষা নিচু গলায় বলল, 'সব চোর ছ্যাচড় বলা ঠিক না।'
'কেন ঠিক না? একশবার

ঠিক। আমার ব্ল্যাকবেরি চুরি গিয়েছে কি না? যদি এই হারামজাদা না নিয়ে থাকে তাহলে অন্য কেউ নিয়েছে। এই জাহাজের কেউ একজন নিয়েছে। এখানে তো বাইরে থেকে কেউ আসবে না। আসবে?'

রাতুল আবার রাজার দিকে তাকাল। তার মুখে এক ধরনের অসহায় আতঙ্ক।

ঠিক এই সময় শারমিনের মা ভিড় ঠেলে এসে ঢুকলেন, 'কী হয়েছে?'

'দেখো আম্মু, এই হারামজাদা আমার ব্ল্যাকবেরি–' শারমিন কথা শেষ না করে হঠাৎ থেমে গেল। সবাই দেখতে পেল শারমিনের মায়ের হাতে একটা দামি মোবাইল ফোন, এটাই নিশ্চয়ই সেই ব্ল্যাকবেরি। শারমিনের মা ইতস্তত করে বললেন, 'তুই ঘুমাচ্ছিলি তাই তোকে ডাকিনি। গাছে একটা বানরের বাচ্চার ছবি তোলার জন্য তোর ব্ল্যাকবেরিটা নিয়েছি।'

শারমিন অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তার মায়ের হাত থেকে মোবাইল ফোনটা নিয়ে দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করল। রাতুলের মাথায় হঠাৎ করে রক্ত উঠে যায়, সে কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এইটা আপনার সেই ব্ল্যাকবেরি?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে এটা আসলে রাজা চুরি করেনি; আপনার মা নিয়ে গিয়েছিলেন?'

শারমিন কোনো কথা বলল না। রাতুল সরু চোখে শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি ধরেই নিলেন রাজা চুরি করেছে? রাজার গায়ে হাত তুললেন?'

শারমিন এবারেও কোনো কথা বলল না। রাতুল শীতল গলায় বলল, 'আপনি কি এখন এই ছেলেটির কাছে মাফ চাইবেন?'

শারমিনের মুখ লাল হয়ে ওঠে, 'আপনার কত বড় সাহস আমাকে এর কাছে মাফ চাইতে বলেন? এই ছেলে এখন চুরি করে নাই তো কী হয়েছে? এর পরে যখন সুযোগ পাবে তখন চুরি করবে।'

রাতুল কিছু একটা বলতে চাইছিল, তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে শারমিন ঘরে ঢুকে ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। কেবিনের সামনে জটলাটা তখন ধীরে ধীরে ভেঙে যেতে শুরু করে।

রাজা চোখ মুছে রাতুলকে বলল, 'দেখলেন তো ভাই আমি চুরি করি নাই।'

'হ্যাঁ দেখেছি।' রাতুল গম্ভীর গলায় বলল, 'আর তুমি দেখেছ তো এই জাহাজে কোনো কিছু হারিয়ে গেলে, চুরি হলেই তোমাকে ধরবে?'

'জে। দেখেছি।'

'কাজেই খুব সাবধান। কেউ যেন তোমাকে কিছু বলতে না পারে।'

'জে ভাই। কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

কিছুক্ষণের মাঝেই আবার বাচ্চাদের ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়; তাদের মাঝে রাজাও আছে, তাকে দেখে মনেই হয় না কোনো কিছু ঘটেছে। কত সহজে কত বড় একটা ঘটনা ভুলে যেতে পারে! ট্রলারে করে দুইজন আনসার জাহাজে ওঠার পর জাহাজটা ছেড়ে দিল। আনসার দুইজনের কাছে দুটো থ্রি নট থ্রি রাইফেল, মানুষ দু'জন সাদাসিধে গোবেচারা ধরনের। কখনও দরকার হলে এই রাইফেল দিয়ে গুলি করতে পারবে বলে মনে হয় না। একজন একটু বয়স্ক, অন্যজন কম বয়সী। তবে দু'জনই স্থানীয় বলে সুন্দরবনের খুঁটিনাটি অনেক কিছু জানে। রাতুল তাদের সাথে কথা বলে নদীর নাম, গাছের নাম, পাখির নাম থেকে শুরু করে রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোথায় থাকে, কী করে, কী খায় এগুলোও জেনে নিল। বাঘকে এখানকার মানুষেরা যে মামা বলে ডাকে সেটাও সে এই দুইজন আনসারের কাছে জানতে পারল।

তাদের জাহাজটা ছোট একটা নদী দিয়ে যাচ্ছে।

দুইপাশে ঘন জঙ্গল, গাছগাছালিতে ভরা। ভাটা শুরু হয়েছে। তাই নদীর পানি কমে কাদা দিয়ে ঢাকা নদীর তীর ভেসে উঠছে। সেখানে নানা ধরনের গাছের শ্বাসমূল সূচালো ছুরির মতো বের হয়ে আসছে। রাতুল জাহাজের ছাদে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখছে। জন্মের পর থেকে সে সুন্দরবনের কথা শুনে আসছে। কিন্তু সেই বনভূমি যে এত বিচিত্র কখনও কল্পনা করেনি। একা একা এত সুন্দর আর এত গহিন জঙ্গলটা দেখতে মন চাইছিল না। তাই সে তৃষাকে খুঁজতে বের হলো। নিচতলায় তার সাথে দেখা হলো। চা বানানোর জন্য গরম পানির ফ্লাস্ক থেকে সে প্লাস্টিকের কাপে পানি ঢালছে, রাতুলকে দেখে তৃষা গম্ভীর হয়ে বলল, 'এখন কার সাথে ঝগড়া করে এসেছিস?'

'ঝগড়া? ঝগড়া করব কেন?'

'তাই তো দেখছি।'

'কখন আমাকে ঝগড়া করতে দেখলি?'

'প্রথমে ঝগড়া করলি শামস ভাইয়ের সাথে, তারপর ঝগড়া করলি শারমিনের সাথে।'

'আমি ঝগড়া করেছি?' রাতুল অবাক হয়ে বলল, 'আমি?'

'হ্যাঁ। তুই ভুলে যাচ্ছিস, এরা আমাদের ইনভাইটেড গেস্ট।' এরা সেলিব্রেটি, এরা আমাদের সাথে আছে বলে আমরা আমাদের ফেস্টিভ্যালগুলো করতে পারি।'

'তার মানে তুই বলছিস তোর ওই শামস ভাইয়ের কোনো কথা পছন্দ না হলে আমি সেটা বলতে পারব না? শারমিন একটা বাচ্চা ছেলেকে মিথ্যা দোষ দিয়ে চড় মেরে দেবে আর আমাকে সেটা দেখতে হবে?'

'না তোকে দেখতে হবে না। কিন্তু তার মানে না তুই তাকে পাল্টা অপমান করবি। এরা দেশের সেলিব্রেটি। তুই সেলিব্রেটি না। তুই একজন ফালতু ভলান্টিয়ার।'

'ফালতু ভলান্টিয়ার?' রাতুল প্রায় আর্তনাদ করে বলল, 'তুই আমাকে ফালতু ভলান্টিয়ার বলতে পারলি?'

তৃষা গরম হয়ে বলল, 'কেন পারব না? তুই ভুলে যাচ্ছিস যে, তুই এই অরগানাইজেশনের কেউ না। আমি তোর কথা বলেছি আর আমার কথাকে বিশ্বাস করে তোকে এখানে আসতে দেওয়া হয়েছে। আর তুই এসে বড় বড় বোলচাল শুরু করেছিস, আর ধাক্কাটা সহ্য করতে হচ্ছে আমাকে। বুঝেছিস?'

অপমানে রাতুলের কান লাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বুঝেছি।'

'মাত্রাজ্ঞান খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ঠিক কখন থামতে হয় সেটা জানতে হয়, সেটা না জানলে খুব মুশকিল। তোর কোনো মাত্রাজ্ঞান নেই, কার সাথে কী রকম ব্যবহার করতে হয় তুই জানিস না। বুঝেছিস?'

রাতুল চুপ করে রইল। তৃষা প্রায় চিৎকার করে বলল, 'বুঝেছিস?' রাতুল আস্তে আস্তে বলল, 'বুঝেছি।'

'শুধু বুঝলে হবে না, মনে রাখতে হবে।'

'মনে রাখব।' রাতুল একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আই এম সরি তৃষা, আমার জন্য তোর এত ঝামেলা হচ্ছে। যদি কোনো উপায় থাকত, আমি তাহলে চলে যেতাম, এখন চলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।'

'আমি তোকে এখন নাটক করতে বলিনি যে, রাগ করে চলে যাবি। আমি শুধু বলেছি–'

'তুই বলেছিস আমি একজন ফালতু ভলান্টিয়ার, আমাকে ফালতু ভলান্টিয়ারের মতো থাকতে হবে। আমি থাকব। তুই নিশ্চিন্ত থাক তৃষা।'

তৃষা কয়েক মুহূর্ত রাতুলের দিকে তাকিয়ে প্লাস্টিকের গ্লাসে চা নিয়ে হেঁটে চলে গেল। রাতুল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল তৃষা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরে কেবিনে সেলিব্রেটিরা থাকে, তৃষা তাদের শান্ত করতে যাচ্ছে। রাতুলের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে তৃষাকে– রাতুলের হঠাৎ মরে যেতে ইচ্ছা করতে থাকে।

তৃষার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে শামস চুমুক দিয়ে বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস চা।'

তৃষা হেসে ফেলল, শামস জিজ্ঞেস করল, 'হাসছ কেন?'

'আপনার ফার্স্ট ক্লাস চা শুনে। কারণ আমি জানি এটা মোটেও ফার্স্ট ক্লাস চা না। এটা ফোর্থ কিংবা ফিফথ ক্লাস চা। টেনেটুনে বড়জোর থার্ড ক্লাস হতে পারে। কিন্তু কোনোভাবেই ফার্স্ট ক্লাস চা না।'

'তুমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস মিস করে গেছ।'

'সেটা কী?'

'যখন মানুষ কোনো একটা কিছু খায় তখন সেটা তার কাছে কতটুকু ভালো লাগবে সেটা নির্ভর করে সে কোন পরিবেশে খাচ্ছে তার ওপর। যখন তুমি খুব দামি একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাও তখন খাবারটা হয়তো খুবই সাধারণ। কিন্তু তোমার কাছে সেটাই অসাধারণ মনে হবে। কারণ তোমার চারপাশের পরিবেশটা অসাধারণ।'

তৃষা ছোট কেবিনটার চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এখানে পরিবেশটা অসাধারণ?'

শামস উত্তর না দিয়ে হাসল। তৃষা জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো?'

শামস মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ অসাধারণ। যতক্ষণ তুমি আছ ততক্ষণ অসাধারণ।'

তৃষা একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল। 'আপনার অবস্থা খুবই খারাপ মনে হচ্ছে।'

'কেন?'

'আমার মতো একজন মানুষকে যদি আপনার পরিবেশকে উন্নত করতে হয় তাহলে অবস্থা খারাপ না?'

'মোটেও খারাপ না। তুমি অসাধারণ।'

'আমি অসাধারণ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

শামস মাথা চুলকানোর ভান করল, 'কোথা থেকে শুরু করব? চেহারা? হাসি? ভাবভঙ্গি? কাজকর্ম?'

'থাক থাক, কোনো জায়গা থেকেই শুরু করতে হবে না।'

'না না, ঠাট্টা না। আমি তো তোমাকে লক্ষ্য করছি। এত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছ, সব সময়েই মাথা ঠাণ্ডা, সব সময়েই হাসিখুশি। তোমার সেই বন্ধুর মতো না।'

'কোন বন্ধু?'

'ওই যে সকালে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিল।'

'ও আচ্ছা। রাতুল।' তৃষা হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে যায়।

'নাম তো জানি না।' শামস বলল, 'ওর সমস্যাটা কী? মনে হচ্ছে সব সময়েই কোনো কিছু নিয়ে রেগে আছে। একজন ইয়ংম্যান অথচ কোনো ড্রাইভ নেই। বিশ্বাস করে, কম্পিটিশন করে বড় হতে হবে না? সব সময়েই একজন নো-বডি হয়ে থাকবে? কখনও সাম-বডি হবে না?'

তৃষা একটা নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, 'আমি ঠিক জানি না, রাতুলের সমস্যাটা কী?'

শামস সুর পাল্টে বলল, 'থাক, রাতুলের কথা থাক। তোমার কথা শুনি। বলো, তোমার কথা বলো।'

তৃষা একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তার কথা সে কী বলবে?

দুপুরবেলা জাহাজটা এক জায়গায় নোঙর ফেলল। দূরে ফরেস্টের একটা টাওয়ার, দুইপাশে ঘন জঙ্গল। জাহাজের সাথে একটা ট্রলার বেঁধে রাখা আছে, সেটাতে করে সবাইকে তীরে নিয়ে যাওয়া হবে। বাচ্চাদের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি।

আসিয়ান শীতলছায়া

কিন্তু প্রথমে আমন্ত্রিত অতিথিরা নেমে গেল, তৃষা তাদের সাথে গেল। সবাইকে নামিয়ে ট্রলারটা ফিরে আসতে আসতে প্রায় পনেরো মিনিট লেগে যায়, এই পনেরো মিনিটে বাচ্চারা একেবারে অধৈর্য হয়ে যায়।

বাচ্চাদের ট্রলারে তোলার সময় রাতুল সতর্ক থাকে, সবাইকে তুলে সে গলা উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সবাই উঠেছ?'

বাচ্চারা চিৎকার করে বলল, 'উঠেছি।'

দেখা যাক সবাই উঠেছে কি-না, একবার গুনে ফেলা যাক। শুরু করো, ওয়ান টু থ্রি।'

রাতুল একটু আগে সবাইকে এক দুই তিন– এভাবে নম্বর দিয়ে দিয়েছে। তারা নিজের নম্বর বলতে লাগল। মৌটুসি চিৎকার করে বলল, 'এক।'

টুম্পা বলল, 'দুই।'

টুবলু বলল, 'তিন।'

তখন শান্তর বলার কথা 'চার'। কিন্তু সে উবু হয়ে পানিতে ভেসে যাওয়া একটা গাছের ডাল ধরার চেষ্টা করছে। কাজেই চার শোনা গেল না।

রাতুল জিজ্ঞেস করল, 'চার? চার কোথায় গেল?'

তখন অন্যেরা শান্তকে টেনে দাঁড় করাল, 'এই যে, এই যে চার।'

রাতুল বলল, 'শান্ত, তোমার নাম্বার বলো।'

শান্ত বলল, 'চার'। তারপর আবার সে উবু হয়ে নদী থেকে গাছের ডালটা ধরার চেষ্টা করতে থাকে।

মিশা বলল, 'পাঁচ।'

দীপন বলল, 'ছয়।'

রাজা বলল, 'সাত।'

এভাবে তেরো নম্বরে গিয়ে শেষ হওয়ার পর রাতুল বলল, 'গুড। ফিরে আসার সময় গুনে গুনে এই তেরোজনকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। ঠিক আছে?'

সবাই চিৎকার করে বলল, 'ঠিক আছে।'

ট্রলার তীরে থামার আগেই বাচ্চারা লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে শুরু করে। বড় মানুষেরা নেমে চারদিকে তাকিয়ে বনভূমির সৌন্দর্য দেখে আহা-উহু করতে থাকে, বাচ্চারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামাল না, তারা চারদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। প্রথমে ছুটে দাপাদাপি করে টাওয়ারের ওপর উঠে গেল। সেখানে কিছু করার নেই বলে আবার দাপাদাপি করে নিচে নেমে এল। তারা যখন গাছের ডাল ধরে টানাটানি করতে থাকে তখন হঠাৎ করে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকা একটা বানর পেয়ে যায়। বাচ্চারা নানাভাবে লোভ দেখিয়ে বানরটাকে নিচে নামিয়ে আনার চেষ্টা করে। বানরটা নিচে নেমে আসার কোনো আগ্রহ দেখাল না, বরং আরও একটু উপরে উঠে একটা গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে নিস্পৃহভাবে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বাচ্চারা তখন বানরটাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল, বানরটা ভয় পেল বলে মনে হয় না, একটু বিরক্ত হওয়ার ভান করে তাদের দিকে মুখ খিঁচিয়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রাতুল সবাইকে নিয়ে আরেকটু এগিয়ে যায়, বনের গাছগাছালির ভেতর দিয়ে কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর হঠাৎ তারা একটা ফাঁকা জায়গায় হাজির হয়। বিশাল একটা মাঠ, দেখে মনে হয় তেপান্তরে চলে এসেছে। বহুদূরে গাছগাছালির সবুজ রেখা, মাঝখানে সবুজ আর শুকনো ঘাসের উঁচু-নিচু প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট-বড় একটি-দুটি গাছ নিঃসঙ্গ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝামাঝি পাতাবিহীন একটা শুকনো গাছ সম্ভবত বাজ পড়ে পুড়ে গেছে।

রাইফেল হাতে মাঝবয়সী আনসারটি একটা ঢিবির ওপর বসে সিগারেট টানতে থাকে। একটা মেঠোপথ বনভূমির দিকে এগিয়ে গেছে, কমবয়সী আনসারটি সেই দিকে এগিয়ে যায়। তার পিছু পিছু উৎসাহী মানুষজন হাঁটতে থাকে।

রাতুল ভেতরে ভেতরে কেমন যেন অবসন্ন অনুভব করে। সে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে রইল। নিজের অজান্তেই সে তৃষাকে খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু তাকে খুঁজে পেল না। বাচ্চারা ছোটাছুটি করে খেলছে। সে অন্যমনস্কভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মৌটুসি এসে জিজ্ঞেস করল, 'স্পাইডার আঙ্কেল, সবাই বিচের দিকে যাচ্ছে, তুমি যাবে না।'

'নাহ।'

'তাহলে আমিও যাব না।'

'কেন, তুমি যাবে না কেন? যাও।'

'যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে তাহলে। বসো।'

মৌটুসি রাতুলের কাছে বসে একটা ছোট কাঠি দিয়ে মাটি খোঁচাতে থাকে। একটু পর রাতুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আঙ্কেল'।

'বলো।'

'তোমার কি মন খারাপ?'

'না না, মন খারাপ না, মন খারাপ কেন হবে'– বলতে গিয়ে রাতুল থেমে গেল। সে মৌটুসির দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, 'হ্যাঁ মৌটুসি, আমার একটু মন খারাপ।'

'মৌটুসি বড় মানুষের মতো বলল, 'আমি বুঝতে পারছিলাম। তোমার কেন মন খারাপ আঙ্কেল?'

রাতুল বলল, 'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে এ রকম হয়। হঠাৎ করে একদিন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে দেখি কেন জানি মন খারাপ। কোনো কারণ নাই, তবু মন খারাপ।'

মৌটুসি বলল, 'আমারও মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। যখন আব্বু আমাকে বকা দেয় তখন আমার মন খারাপ হয়। যখন আম্মু আর আব্বু ঝগড়া করে তখন আমার মন খারাপ হয়। যখন স্কুলে আমার বন্ধুরা আমাকে খেলতে নেয় না তখন আমার মন খারাপ হয়।'

'মন খারাপ হলে তুমি কী করো?'

'কিছু করি না। মাঝে মধ্যে একটু কাঁদি। তারপর যখন আম্মু আমাকে আদর করে না হয় আম্মু-আব্বু আর ঝগড়া করে না, আর বন্ধুরা যখন খেলতে নেয় তখন আবার মন ভালো হয়ে যায়।'

মৌটুসি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি চিন্তা করো না আঙ্কেল, দেখবে আবার তোমার মন ভালো হয়ে যাবে।'

রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ কোনো কারণ ছাড়া যখন মন খারাপ হয় তখন আবার কোনো কারণ ছাড়াই মন ভালো হয়ে যায়।'

কথাটা মৌটুসির খুব পছন্দ হলো। সে অনেকক্ষণ হি হি করে হাসল। রাতুল এক ধরনের হিংসার চোখে এই বাচ্চা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে– কত সহজে এরা কত আনন্দ পেয়ে যায়। ঠিক তখন তাদের সামনে দিয়ে অনেকগুলো হরিণ ছুটে যায়। মৌটুসি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, চিৎকার করে বলে, 'হরিণ! হরিণ!'

'হ্যাঁ, হরিণ!'

'কী সুন্দর হরিণ!'

রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'হ্যাঁ। হরিণ খুব সুন্দর। যখন দৌড়ায় তখন আরও সুন্দর দেখায়।'

'হরিণগুলো কেন দৌড়াচ্ছে স্পাইডার আংকেল?'

'আমাদের দেখে মনে হয় ভয় পেয়েছে।'

'আমরা তো কিছু করি নাই। করেছি?'

'না। কিছু করি নাই। কিন্তু বনের পশু তো– তাই মানুষ থেকে দূরে থাকে।'

মৌটুসি হঠাৎ চোখ বড় বড় করে বলল, 'মনে হয় একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার ধাওয়া করেছে।'

রাতুল হাসল, বলল, 'হতে পারে।'

মৌটুসি আঙুলে গুনে গুনে

বলল, 'আমরা কুমির দেখেছি, বানর দেখেছি, অনেক রকম পাখি দেখেছি, গুইসাপ দেখেছি, গুগুক দেখেছি, হরিণ দেখেছি। কিন্তু এখনও কোনো বাঘ দেখিনি।'

'বাঘ দেখা সোজা না। তারা তোমার সামনে আসবে না।' রাতুল দূরে রাইফেল হাতে বসে থাকা আনসারটিকে দেখিয়ে বলল, 'দেখছ না, সব সময়ে একজন মানুষ রাইফেল নিয়ে বসে আছে। বাঘ তো বোকা না!'

'সুন্দরবন এসে বাঘ না দেখে চলে যাব?'

'মনে হয়।' রাতুল মাথা নেড়ে বলল, 'খুব বেশি হলে তুমি বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পারো।'

'পায়ের ছাপ? কোথায়?'

'যেখানে বাঘ পানি খেতে আসে সেখানে।' হঠাৎ রাতুলের মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে।

মৌটুসি জিজ্ঞেস করল, 'কী রয়েছে স্পাইডার আংকেল?'

'চলো আমরা একটা কাজ করি।'

'কী কাজ?'

'এখানে বাঘের পায়ের ছাপ তৈরি করে রাখি। সবাই যখন আসবে তারা বাঘের পায়ের ছাপ দেখে হইচই শুরু করে দেবে। ভাববে সত্যি বাঘ এসেছে!'

মৌটুসির মুখে এগাল-ওগাল জোড়া হাসি ফুটে উঠল, 'তুমি বাঘের পায়ের ছাপ তৈরি করতে পারবে? কেমন হয় বাঘের পায়ের ছাপ?'

'সেটা তো জানি না। কিন্তু কেউই তো জানে না! তাই আমরা যেটা তৈরি করব সেটাই হবে বাঘের পায়ের ছাপ।'

রাতুল তখন মৌটুসিকে নিয়ে একটু সরে গেল। সবাই যে পথ দিয়ে আসছে সেখানে খুঁজে খুঁজে খানিকটা নরম মাটি বের করল। তারপর সেখানে বাঘের পায়ের ছাপ তৈরি করতে বসে গেল। রাতুল বাঘের পায়ের ছাপ দেখেনি। কিন্তু ধরেই নিল সেটা হবে বিড়ালের থাবার মতো। তবে তার থেকে অনেক বড়। বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যেটা তৈরি হলো সেটা দেখতে খারাপ হলো না। যারা চেনে না তাদের কাছে বাঘের পায়ের ছাপ হিসেবে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যাবে। শুধু একটা ছাপ হলে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কাজেই আরও কয়েকটা পায়ের ছাপ তৈরি হলো, দেখে যেন মনে হয় বাঘটা এই পথ দিয়ে হেঁটে গেছে।

তাদের কাজ যখন শেষের দিকে তখন রাতুল আর মৌটুসি দেখতে পেল তাদের দলটি ফিরে আসছে। তারা দু'জন সেখান থেকে সরে গিয়ে আগের জায়গায় বসে গেল। এত কষ্ট করে বাঘের পায়ের ছাপ তৈরি করেছে, এখন কেউ যদি লক্ষ্য না করে সেটা হবে রীতিমতো হৃদয়বিদারক!

দূর থেকে রাতুল আর মৌটুসি লক্ষ্য করল দলটির একটা বড় অংশ বাঘের পায়ের ছাপটি না দেখেই সামনে এগিয়ে গেল, তখন হঠাৎ ওটি একজনের চোখে পড়ল এবং মুহূর্তের মধ্যে সবাই বাঘের পায়ের ছাপকে ঘিরে দাঁড়াল। রাতুল আর মৌটুসি দেখল, আনসারটি তার ঘাড় থেকে রাইফেল হাতে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে।

মাঝবয়সী আনসারটিও তখন এগিয়ে যায়, রাতুল আর মৌটুসিও তার সাথে সাথে সামনে হাঁটতে থাকে। রাতুল মৌটুসির হাত ধরে ফিসফিস করে বলল, 'খবরদার মৌটুসি, হাসবে না কিন্তু।'

'না, হাসব না।' বলে মৌটুসি একবার ফিক করে হেসে ফেলল।

বাঘের পায়ের ছাপের কাছে গিয়ে রাতুল আবিষ্কার করল, সবাই মিলে বাঘের পায়ের ছাপের ছবি নিচ্ছে। শামস তৃষাকে বসিয়ে তার ক্যামেরা ফোকাস করতে করতে বলল, 'তৃষা, তুমি মুখটা আরেকটু গম্ভীর করো। ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন হবে খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা বিস্ময় এবং অনেকটুকু আতঙ্ক।' তৃষা তার মুখে কৌতূহল, বিস্ময় আর আতঙ্কের একটা মিশ্রণ তৈরি করার চেষ্টা করল, সেটা হলো অনেকটা অতি নাটকীয় এবং শামস তার দামি ক্যামেরায় ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে তৃষার অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলল।

বয়স্ক আনসারটা বাঘের পায়ের ছাপটা দেখে মাথা চুলকে বলল, 'খুবই আজিব।'

আলমগীর ভাই বললেন, 'কী আজিব?'

'এই যে বাঘের পায়ের ছাপ।'

শামস জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে বাঘের ছাপে?'

'আমি ধরেন অনেক বাঘের পায়ের ছাপ দেখেছি। কিন্তু এ রকম পায়ের ছাপ কখনও দেখি নাই।'

'কেন?'

'এইখানে যে রকম মাটি সেইখানে এই রকম একটা পায়ের ছাপের জন্যে বাঘের সাইজটা হওয়া দরকার হাতির মতন। এই মাটিতে এত গভীর ছাপ পড়ার কথা না।'

শামস গম্ভীর হয়ে বলল, 'পড়ার কথা না বলে তো লাভ নেই– আপনি নিজের চোখে দেখেছেন পড়েছে। হয়তো বাঘটা আসলেই বিশাল ছিল।'

'শুধু যে সাইজ বড় হওয়ার কথা তা না', আনসারটা আবার মাথা চুলকালো। 'বাঘের ধরেন চার পা, সে চার পা দিয়ে হাঁটে। এইখানে খালি দুই পায়ের ছাপ। মনে হচ্ছে–'

'কী মনে হচ্ছে?'

'এই বাঘ দুই পা দিয়ে মানুষের মতো হেঁটে গেছে।' কথা শেষ করে সে হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ তার হাসিতে যোগ দিল না। শুধু শামস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'যত্তোসব রাবিশ!'

রাতুল আর মৌটুসি একজনের দিকে আরেকজন তাকিয়ে হাসল। আলমগীর ভাই বললেন, 'এখন মুখ থেকে খুব হাসি বের হচ্ছে। যদি সত্যি সত্যিই রয়েল বেঙ্গল টাইগার বের হয়ে আসত তাহলে দেখতাম মুখে কত হাসি বের হয়।'

গীতি রাতুলকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে বিচে দেখলাম না।'

'না, আমি যাইনি। আমি আর মৌটুসি এখানে ছিলাম।'

'তোমরা কিছু দেখেছ নাকি?'

'নাহ। শুধু দেখলাম হঠাৎ অনেকগুলো হরিণ ছুটে গেল।' রাতুল মুখ গম্ভীর করে বলল, 'তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি, বাঘটা তখন মনে হয় হরিণগুলোকে তাড়া করেছিল।'

মৌটুসি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, তাড়া করেছিল।'

তৃষা দুশ্চিন্তিত মুখে বলল, 'তাহলে বাঘটা হয়তো আশপাশে আছে, আমাদের তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে যাওয়া দরকার।'

'হ্যাঁ।' আলমগীর ভাই বললেন, 'চলো, জাহাজে চলো সবাই।'

সবাই যখন হাঁটতে শুরু করে তখন শামস তৃষাকে বলল, 'তৃষা, তুমি এখানে দাঁড়াও, তোমার একটা ছবি তুলি।'

তৃষা দাঁড়াল, তার মুখে একটা বিব্রত ভাব। শামস কয়েকটা ছবি তুলে ক্যামেরাটা রাতুলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের দু'জনের একটা ছবি তুলে দেবে?'

রাতুল কোনো কথা না বলে ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে তৃষা আর শামসের ছবি তুলে দিল। ক্যামেরার লেন্সের ভেতর দিয়ে পাশাপাশি দু'জনের হাসিমুখ দেখে তার বুকের ভেতর কেমন যেন জ্বলে-পুড়ে যেতে থাকে।

রাতে খাওয়ার পর নিচতলায় বাচ্চাদের জন্যে রাতুল ডিসকো নাচের ব্যবস্থা করল। সারাদিন ধুমধাড়াক্কা ধরনের যে কয়টা গান সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো ল্যাপটপ থেকে বাজানোর ব্যবস্থা করা হলো। সাউন্ড সিস্টেমের খুঁটিনাটি ঠিক করে রাতুল গানগুলো বাজাতে থাকে। স্পিকারে বিকট সুরে সেই গান বাজতে থাকে এবং বাচ্চাগুলো সেই গানের সাথে নাচানাচি শুরু করে দেয়। প্রথমে তাদের একটু একটু লজ্জা লাগছিল, তখন রাজা এসে অত্যন্ত

বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করে। তার বিচিত্র নাচ দেখে অনেকেরই লজ্জা ভেঙে যায় এবং সবাই লাফালাফি শুরু করে দেয়।

গানের বিকট সুরই হোক আর বাচ্চাদের আনন্দোল্লাসই হোক, জাহাজের অনেকেই নিচে নেমে তাদের দেখতে থাকে। প্রথমে মৌটুসি তার মা-বাবাকে টেনে নাচের আসরে নামিয়ে দেয়। তারা নাচের ভঙ্গি করে একটু নাড়াচাড়া করলেন। তখন বাচ্চারা সবাইকে টেনে আনতে লাগল। কেউ কেউ বেশ আগ্রহ নিয়ে নাচার চেষ্টা করল। রাতুল সাউন্ড সিস্টেমে গান বাজাতে বাজাতে লক্ষ্য করল, বাচ্চারা শামস এবং শারমিনকেও ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসেছে। শারমিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে এক সময় সরে গেল, শামস আর গেল না, বেশ দক্ষ নৃত্যশিল্পীর মতো নাচতে থাকে। রাতুল লক্ষ্য করল, শামস নাচতে নাচতে তৃষাকে ডাকছে এবং বাচ্চারা প্রচণ্ড উৎসাহে তৃষাকে টেনে নিয়ে এসেছে। শামস তৃষার হাত ধরল এবং দু'জন বেশ সহজভাবে নাচতে লাগল। বাচ্চাদের কয়েকজন হঠাৎ করে রাতুলকে দেখতে পেল এবং সমস্বরে চিৎকার করে তার দিকে ছুটে তাকে নাচের আসরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টানাটানি করতে থাকে।

রাতুল মাথা নেড়ে বলল, 'আমি নাচতে পারি না।'

মৌটুসি হাসতে হাসতে বলল, 'আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব আংকেল। খুব সোজা।'

'তুমি শিখালেও আমি পারব না মৌটুসি। তাছাড়া আমি সাউন্ড সিস্টেম থেকে চলে গেলে এটা চালাবে কে?'

বাচ্চারা যুক্তিতর্কের ধারেকাছে গেল না, বলল, 'কিছু হবে না। তুমি চলো।'

রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'উঁহু, আমি যাব না।'

'কেন যাবে না?'

'আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাব। বুঝেছ?'

'ও।' মৌটুসি কিছুক্ষণ রাতুলের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নাচের আসরে শামস আর তৃষার দিকে তাকাল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল।

রাতুল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে সে আবিষ্কার করে তাকিয়ে থেকেও সে কিছু দেখছে না। কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থেকেও যে সেটি না দেখা সম্ভব সেটা সে আগে কখনও লক্ষ্য করেনি।

৩.

ট্রলারটা জাহাজের পাশে এসে থামল, তখন একজন একজন করে সবাই জাহাজে উঠতে থাকে। আলমগীর ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'সবাই এসেছে?'

তৃষা বলল, 'হ্যাঁ এসেছে। এটা লাস্ট ট্রিপ।'

ভোরবেলা সমুদ্রের মোহনায় জাহাজটা নোঙর করেছে। তখন ট্রলারে করে সবাইকে কাছাকাছি একটা দ্বীপে নামানো হয়েছে। এখানে চমৎকার একটা বালুবেলা আছে, বালুবেলার পাশে গহিন জঙ্গল। সবাই সেখানে সময় কাটিয়ে জাহাজে ফিরে এসেছে, সবাইকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাড়াহুড়া ছিল। কারণ একটু পরেই ভাটা শুরু হবে। তারা যে পথ দিয়ে ফিরে যাবে সেটা সরু একটা চ্যানেল, ভাটার সময় সেখানে পানি কমতে থাকে। পানি বেশি কমে গেলে সেই পথ দিয়ে যাওয়া যায় না। যারা জাহাজে আছে তারা সবাই আবিষ্কার করেছে, নদী আর সমুদ্র যেখানে একে অন্যের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায় সেখানে সবাইকে প্রতি মুহূর্তে এই জোয়ার-ভাটা নিয়ে সতর্ক থাকতে হয়। এখানকার মানুষের জীবন জোয়ার আর ভাটার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।

জাহাজের একজন মানুষ জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজটা তাহলে ছেড়ে দিই।'

আলমগীর ভাই মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ ছেড়ে দেন।'

তৃষা বলল, 'এক সেকেন্ড। শেষবারের মতো নিশ্চিত হয়ে নিই, সবাই এসেছে কি-না। কাউকে এই দ্বীপে ফেলে এলে সেটা ভালো হবে না।'

সে এদিক-সেদিক তাকায়, রাতুল কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, তৃষা জিজ্ঞেস করল, 'সব বাচ্চারা এসেছে?'

'এসেছে।'

'বড়রা?'

'জানি না, আমি খেয়াল করিনি। একটু খেয়াল করে সবাই সবাইকে দেখে নিলেই হয়।'

কাজেই সবাই সবাইকে দেখতে শুরু করল। হঠাৎ নাট্যকার বাতিউল্লাহ বললেন, 'শাহরিয়ার মাজিদকে দেখছি না। তার কেবিনে আছেন?'

দেখা গেল কেবিনে নেই। কোনো বাথরুমে নেই। জাহাজের ছাদেও নেই। বাতিউল্লাহ বললেন, 'দ্বীপে গিয়েই কেমন যেন ওড়া ওড়া হয়ে গেল। আমাকে বলল, আমি এখানেই বসত করব।'

'এখানে বসত করবেন মানে?'

'কবি মানুষ, কখন মাথায় কী আসে কে বলবে?'

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সবার সাথে কথা বলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, জাহাজ থেকে দ্বীপে যাওয়ার সময় অনেকেই তাকে দেখেছে। আসার সময় কেউ দেখেনি। যার অর্থ, কবি শাহরিয়ার মাজিদ দ্বীপটাতে রয়ে গেছেন– কে জানে হয়তো বসত করে ফেলেছেন।

তৃষা বলল, 'গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। কে যাবি?'

রাতুল বলল, 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

রাতুলের সাথে একজন আনসার এবং আরও কয়েকজন দ্বীপটিতে শাহরিয়ার মাজিদকে খুঁজতে রাজি হয়ে গেল। তাকে শেষবার দ্বীপের কোন অংশে দেখা গেছে সেটা শুনে তারা ট্রলারে উঠে বসে। জাহাজের মানুষজন খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমাদের কিন্তু খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি যদি রওনা না দিই, পৌঁছাতে পারব না। তখন সমুদ্র ঘুরে যেতে হবে।'

আলমগীর ভাই বললেন, 'কিন্তু আমাদের তো কিছু করার নাই। একজন মানুষকে তো ফেলে রেখে যেতে পারি না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন, পুরা ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে।'

'কেন, বিপজ্জনক কেন?'

'সমুদ্রে ডুবোচর থাকে। যদি আটকে যাই তাহলে মহাবিপদ। এমনিতেও জায়গা ভালো না–'

'ভালো না মানে?'

'বলতে চাচ্ছিলাম না। ডাকাতের উৎপাত থাকে।'

'ডাকাত?'

'জে।'

আলমগীর ভাই দুশ্চিন্তিত মুখে গাল চুলকালেন।

তৃষা বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। রাতুল গিয়েছে তো, সে খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে।'

রাতুল খুব সহজেই শাহরিয়ার মাজিদকে খুঁজে বের করে ফেলল। সমুদ্রের তীরে একটা ঝাউগাছের নিচে একটা নোট বই আর একটা বল পয়েন্ট কলম নিয়ে বসে আছেন। তারা সবাই মিলে তার নাম ধরে ডাকাডাকি করেছে। কিন্তু এই মানুষটি এত কাছে বসে থেকেও না শোনার ভান করে বসে আছে। রাতুল শাহরিয়ার মাজিদের কাছে গিয়ে তাকে ডাকল, 'স্যার।' শাহরিয়ার মাজিদ তার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'উঁ।'

'আমরা আপনাকে খুঁজছি। আপনাকে ডাকছিলাম, আপনি শোনেননি?'

'শুনব না কেন? শুনেছি?'
'তাহলে উত্তর দিলেন না কেন? সবাই ভাবছে কিছু না কিছু হয়ে গেছে।'
শাহরিয়ার মাজিদ তার কথার উত্তর না দিয়ে বল পয়েন্ট কলমটার গোড়া কামড়াতে কামড়াতে নোট বইয়ের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।
রাতুল একটু অধৈর্য হয়ে বলল, 'জাহাজের সবাই অপেক্ষা করছে। আপনি গেলে জাহাজ ছেড়ে দেবে। ভাটা শুরু হয়ে গেছে– এই মুহূর্তে রওনা না দিলে আমরা আটকে যাব।'
শাহরিয়ার মাজিদ বললেন, 'উঁ।' তারপর তার নোট বইয়ে কয়েকটা শব্দ লিখলেন, দেখে মনে হলো না জাহাজ ছাড়া নিয়ে তার কোনো চিন্তা আছে।
রাতুল আবার ডাকল, 'স্যার।'
শাহরিয়ার মাজিদ এই প্রথমবার রাতুলের দিকে তাকালেন, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কেন আমাকে বিরক্ত করছ। তুমি দেখছ না আমি একটা কবিতা লিখছি?'
রাতুল কী বলবে বুঝতে পারল না। একজন মানুষ যে এ রকম হতে পারে সে কল্পনাও করতে পারে না। মরিয়া হয়ে বলল, 'আপনি জাহাজে গিয়ে লিখেন–'
শাহরিয়ার মাজিদ চোখ পাকিয়ে রাতুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছেলে, আমি তোমার ঔদ্ধত্য দেখে হতবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি কবি শাহরিয়ার মাজিদকে বলছ সে কোথায় কবিতা লিখবে?'
রাতুল দুই হাত তুলে পিছিয়ে গেল, শাহরিয়ার মাজিদ আবার তার নোট বইয়ের ওপর ঝুঁকে একটা শব্দ লিখলেন, তার মুখে একটা সন্তুষ্টির ছাপ পড়ল।
আনসার মানুষটি রাতুলের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল, 'কী হচ্ছে?'
রাতুল ইঙ্গিতে জানাল– সে কিছু জানে না।
আনসার মানুষটি তখন রাতুলকে ডেকে এক পাশে নিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'মাথায় গোলমাল আছে?'
রাতুল ফিসফিস করে বলল, 'বিখ্যাত কবি। কবিতা লেখার ভাব এসেছে।'
'জাহাজে যাবে না?'
'মনে হয় না।'
'জোর করে ধরে নিয়ে যাই? আমি একদিকে ধরি, আপনি অন্যদিকে ধরেন।'
'মাথা খারাপ? এরা সেলিব্রেটি মানুষ, এদেরকে ঘাঁটাতে হয় না।'
'কিন্তু– কিন্তু–' আনসার মানুষটি কী বলবে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে রাতুলের দিকে তাকিয়ে রইল।
রাতুলের সাথে আরও দু'জন এসেছে। তারা রাতুলের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এখন কী করি?'
'আমি জানি না। এরা সেলিব্রেটি মানুষ, আমি এর মাঝে দুইজনকে ঘাঁটিয়ে বিপদের মাঝে আছি। তিন নম্বরকে ঘাঁটাতে পারব না।'
'তাহলে?'
'তোমরা গিয়ে বলে দেখো।'
'বলব?'
'আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি এর মাঝে নেই।' বলে রাতুল অন্য একটা ঝাউগাছে হেলান দিয়ে বসে গেল। সামনে বালুবেলা, দূরে সমুদ্র, পরিষ্কার নীল আকাশ। সেখানে কয়েকটা গাঙচিল উড়ছে। এ রকম একটা জায়গায় এসে কবি শাহরিয়ার মাজিদের ভাব এসে যাবে তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?
ছেলেটি শাহরিয়ার মাজিদকে ওঠার কথা বলে একটা রাম ধমক খেয়ে মুখ কালো করে ফিরে এসে বলল, 'চলো ফিরে যাই।'
'ফিরে যাব?' রাতুল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'না নিয়ে?'
হ্যাঁ, যেতে না চাইলে তো আর জোর করে নিতে পারি না।'
'তোমাদের কারও কাছে মোবাইল আছে? থাকলে তৃষাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করো এখন কী করব? আমার মোবাইলে চার্জ নেই।'
একজনের মোবাইলে নেটওয়ার্কের হালকা একটা চিহ্ন দেখা গেল। কয়েকবার চেষ্টা করার পর তৃষা ফোন ধরল, ভয় পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হ্যালো, কী হয়েছে? পাওয়া যায় নাই?'
'পাওয়া গেছে। কিন্তু স্যার আসতে চাইছেন না।'
তৃষা অবাক হয়ে বলল, 'আসতে চাইছেন না মানে?'
'আসতে চাইছেন না মানে আসতে চাইছেন না।'
'কেন?'
'স্যার কবিতা লিখছেন। মনে হয় কবিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসবেন না।'
তৃষা অধৈর্য হয়ে বলল, 'তোরা বুঝিয়ে বলিসনি?'
'বলা হয়েছে। রাতুল অনেক চেষ্টা করেছে–'
'রাতুল কোথায়? ফোনটা রাতুলকে দে।'
রাতুল ফোন ধরে বলল, 'বলো তৃষা।'
'তুই টের পাচ্ছিস কী হচ্ছে? আমাদের ছাড়তে দেরি হলে ভেতরে ঢুকতে পারব না। সমুদ্রে আটকা পড়ব।'
'জানি।'
'তাহলে? ওনাকে নিয়ে আসছিস না কেন?'
'আমি চেষ্টা করেছি। লাভ হয় নাই। আমার সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমি যেহেতু ফালতু ভলান্টিয়ার সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।'
'তাহলে?'
'এখন একটা উপায়।'
'কী?'
'জোর করে ধরে আনা। কিন্তু আমাকে লিখিতভাবে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে। পরে আমাকে বলবি ফালতু ভলান্টিয়ার হয়ে তোদের

আমারবই.কম

বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করে। তার বিচিত্র নাচ দেখে অনেকেরই লজ্জা ভেঙে যায় এবং সবাই লাফালাফি শুরু করে দেয়।

গানের বিকট সুরই হোক আর বাচ্চাদের আনন্দোল্লাসই হোক, জাহাজের অনেকেই নিচে নেমে তাদের দেখতে থাকে। প্রথমে মৌটুসি তার মা-বাবাকে টেনে নাচের আসরে নামিয়ে দেয়। তারা নাচের ভঙ্গি করে একটু নাড়াচাড়া করলেন। তখন বাচ্চারা সবাইকে টেনে আনতে লাগল। কেউ কেউ বেশ আগ্রহ নিয়ে নাচার চেষ্টা করল। রাতুল সাউন্ড সিস্টেমে গান বাজাতে বাজাতে লক্ষ্য করল, বাচ্চারা শামস এবং শারমিনকেও ঠেলে ঠেলে নিয়ে এসেছে। শারমিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে এক সময় সরে গেল, শামস আর গেল না, বেশ দক্ষ নৃত্যশিল্পীর মতো নাচতে থাকে। রাতুল লক্ষ্য করল, শামস নাচতে নাচতে তৃষাকে ডাকছে এবং বাচ্চারা প্রচণ্ড উৎসাহে তৃষাকে টেনে নিয়ে এসেছে। শামস তৃষার হাত ধরল এবং দু'জন বেশ সহজভাবে নাচতে লাগল। বাচ্চাদের কয়েকজন হঠাৎ করে রাতুলকে দেখতে পেল এবং সমস্বরে চিৎকার করে তার দিকে ছুটে তাকে নাচের আসরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টানাটানি করতে থাকে।

রাতুল মাথা নেড়ে বলল, 'আমি নাচতে পারি না।'

মৌটুসি হাসতে হাসতে বলল, 'আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব আংকেল। খুব সোজা।'

'তুমি শিখালেও আমি পারব না মৌটুসি। তাছাড়া আমি সাউন্ড সিস্টেম থেকে চলে গেলে এটা চালাবে কে?'

বাচ্চারা যুক্তিতর্কের ধারেকাছে গেল না, বলল, 'কিছু হবে না। তুমি চলো।'

রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'উঁহু, আমি যাব না।'

'কেন যাবে না?'

'আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। মনে হচ্ছে মাথা ঘুরে পড়ে যাব। বুঝেছ?'

'ও।' মৌটুসি কিছুক্ষণ রাতুলের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নাচের আসরে শামস আর তৃষার দিকে তাকাল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল।

রাতুল একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। একটু পরে সে আবিষ্কার করে তাকিয়ে থেকেও সে কিছু দেখছে না। কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থেকেও যে সেটি না দেখা সম্ভব সেটা সে আগে কখনও লক্ষ্য করেনি।

৩.

ট্রলারটা জাহাজের পাশে এসে থামল, তখন একজন একজন করে সবাই জাহাজে উঠতে থাকে। আলমগীর ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'সবাই এসেছে?'

তৃষা বলল, 'হ্যাঁ এসেছে। এটা লাস্ট ট্রিপ।'

ভোরবেলা সমুদ্রের মোহনায় জাহাজটা নোঙর করেছে। তখন ট্রলারে করে সবাইকে কাছাকাছি একটা দ্বীপে নামানো হয়েছে। এখানে চমৎকার একটা বালুবেলা আছে, বালুবেলার পাশে গহিন জঙ্গল। সবাই সেখানে সময় কাটিয়ে জাহাজে ফিরে এসেছে, সবাইকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে তাড়াহুড়া ছিল। কারণ একটু পরেই ভাটা শুরু হবে। তারা যে পথ দিয়ে ফিরে যাবে সেটা সরু একটা চ্যানেল, ভাটার সময় সেখানে পানি কমতে থাকে। পানি বেশি কমে গেলে সেই পথ দিয়ে যাওয়া যায় না। যারা জাহাজে আছে তারা সবাই আবিষ্কার করেছে, নদী আর সমুদ্র যেখানে একে অন্যের সাথে মিলে একাকার হয়ে যায় সেখানে সবাইকে প্রতি মুহূর্তে এই জোয়ার-ভাটা নিয়ে সতর্ক থাকতে হয়। এখানকার মানুষের জীবন জোয়ার আর ভাটার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলে।

জাহাজের একজন মানুষ জিজ্ঞেস করল, 'জাহাজটা তাহলে ছেড়ে দিই।'

আলমগীর ভাই মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ ছেড়ে দেন।'

তৃষা বলল, 'এক সেকেন্ড। শেষবারের মতো নিশ্চিত হয়ে নিই, সবাই এসেছে কি-না। কাউকে এই দ্বীপে ফেলে এলে সেটা ভালো হবে না।'

সে এদিক-সেদিক তাকায়, রাতুল কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল, তৃষা জিজ্ঞেস করল, 'সব বাচ্চারা এসেছে?'

'এসেছে।'

'বড়রা?'

'জানি না, আমি খেয়াল করিনি। একটু খেয়াল করে সবাই সবাইকে দেখে নিলেই হয়।'

কাজেই সবাই সবাইকে দেখতে শুরু করল। হঠাৎ নাটাকার বাতিউল্লাহ বললেন, 'শাহরিয়ার মাজিদকে দেখছি না। তার কেবিনে আছেন?'

দেখা গেল কেবিনে নেই। কোনো বাথরুমে নেই। জাহাজের ছাদেও নেই। বাতিউল্লাহ বললেন, 'দ্বীপে গিয়েই কেমন যেন ওড়া ওড়া হয়ে গেল। আমাকে বলল, আমি এখানেই বসত করব।'

'এখানে বসত করবেন মানে?'

'কবি মানুষ, কখন মাথায় কী আসে কে বলবে?'

খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সবার সাথে কথা বলে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হলো, জাহাজ থেকে দ্বীপে যাওয়ার সময় অনেকেই তাকে দেখেছে। আসার সময় কেউ দেখেনি। যার অর্থ, কবি শাহরিয়ার মাজিদ দ্বীপটাতে রয়ে গেছেন– কে জানে হয়তো বসত করে ফেলেছেন।

তৃষা বলল, 'গিয়ে খুঁজে নিয়ে আসতে হবে। কে যাবি?'

রাতুল বলল, 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

রাতুলের সাথে একজন আনসার এবং আরও কয়েকজন দ্বীপটিতে শাহরিয়ার মাজিদকে খুঁজতে রাজি হয়ে গেল। তাকে শেষবার দ্বীপের কোন অংশে দেখা গেছে সেটা শুনে তারা ট্রলারে উঠে বসে। জাহাজের মানুষজন খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'আমাদের কিন্তু খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে। এক্ষুনি যদি রওনা না দিই, পৌঁছাতে পারব না। তখন সমুদ্র ঘুরে যেতে হবে।'

আলমগীর ভাই বললেন, 'কিন্তু আমাদের তো কিছু করার নাই। একজন মানুষকে তো ফেলে রেখে যেতে পারি না।'

'আপনি বুঝতে পারছেন, পুরা ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে যাবে।'

'কেন, বিপজ্জনক কেন?'

'সমুদ্রে ডুবোচর থাকে। যদি আটকে যাই তাহলে মহাবিপদ। এমনিতেও জায়গা ভালো না–'

'ভালো না মানে?'

'বলতে চাচ্ছিলাম না। ডাকাতের উৎপাত থাকে।'

'ডাকাত?'

'জে।'

আলমগীর ভাই দুশ্চিন্তিত মুখে গাল চুলকালেন।

তৃষা বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। রাতুল গিয়েছে তো, সে খুঁজে বের করে নিয়ে আসবে।'

রাতুল খুব সহজেই শাহরিয়ার মাজিদকে খুঁজে বের করে ফেলল। সমুদ্রের তীরে একটা ঝাউগাছের নিচে একটা নোট বই আর একটা বল পয়েন্ট কলম নিয়ে বসে আছেন। তারা সবাই মিলে তার নাম ধরে ডাকাডাকি করেছে। কিন্তু এই মানুষটি এত কাছে বসে থেকেও না শোনার ভান করে বসে আছে। রাতুল শাহরিয়ার মাজিদের কাছে গিয়ে তাকে ডাকল, 'স্যার।'

শাহরিয়ার মাজিদ তার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'উঁ।'

'আমরা আপনাকে খুঁজছি। আপনাকে ডাকছিলাম, আপনি শোনেননি?'

এশিয়ান শীতলছায়া

সেলিব্রেটি গেস্টদের অপমান করেছি।'
'বাজে কথা বলিস না।'
রাতুল গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি একটাও বাজে কথা বলছি না।'
'আমি কি শাহরিয়ার মাজিদের সাথে কথা বলতে পারি?'
'যদি উনি রাজি হন। আমি চেষ্টা করতে পারি।'
রাতুল টেলিফোনটা নিয়ে শাহরিয়ার মাজিদের কাছে গিয়ে বলল, 'স্যার।'
শাহরিয়ার মাজিদ তার দিকে ঘুরে তাকালেন না। রাতুল আবার ডাকল, 'স্যার।'
কোনো উত্তর নেই। রাতুল তখন টেলিফোনটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তৃষা আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে।'
শাহরিয়ার মাজিদ টেলিফোনটা হাতে নিয়ে সেটাকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে খানিকটা দূরে ছুড়ে ফেলে তার নোট বইয়ে আরও দুটো শব্দ লিখলেন।
এই প্রথম রাতুল পুরো ব্যাপারটার হাস্যকর দিকটা দেখতে পেল, সে টেলিফোনটা তুলে হাসতে হাসতে দূরে আরেকটা ঝাউগাছের নিচে গিয়ে বসল। টেলিফোনে তৃষা বলছে, 'হ্যালো হ্যালো।'
রাতুল বলল, 'বলো।'
'কী হয়েছে?'
রাতুল হাসতে হাসতে বলল, 'তোদের সেলিব্রেটি কবি শাহরিয়ার মাজিদ টেলিফোনটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন।'
'তুই হাসছিস?'
'কী করব? কাঁদব? এ রকম কমিক দৃশ্য আমি খুব বেশি দেখি নাই।'
কবি শাহরিয়ার মাজিদের কারণে জাহাজটা ছাড়তে দুই ঘণ্টা দেরি হলো। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাজেই সরু চ্যানেলটা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা না করে সমুদ্র দিয়ে ঘুরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। জাহাজে যারা আছে তাদের বেশির ভাগই অবশ্যি বিষয়টা জানতেও পারল না, যারা জানতে পারল তারা সে রকম গুরুত্ব দিল না। সবাই সারাক্ষণ জাহাজের ভেতর আছে, খিদে পেলে খেতে পাচ্ছে, ঘুমানোর সময় ঘুমাতে পারছে। কাজেই জাহাজটি কোন পথে যাচ্ছে সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে রাজি না। ঘণ্টা দুয়েক পর সবাইকে অবশ্যি মাথা ঘামাতে হলো এবং সেটা ঘটল খুবই নাটকীয়ভাবে।
জাহাজটা তার ইঞ্জিনের গুমগুম শব্দ করে এগিয়ে যাচ্ছে। বামদিকে বহু দূরে সুন্দরবনের বনভূমির ডানদিকে সমুদ্র। সূর্যটা পিছন দিকে হেলে পড়েছে। শীতের বিকেলের একটা হিমেল হাওয়া। জাহাজের ছাদে বাচ্চারা ছোটাছুটি করছে, মাঝামাঝি জায়গায় রাতুল বসেছে, তার কোলে একটা গিটার। কেউ একজন তার কাছে দিয়ে উধাও হয়ে গেছে। সে টুংটাং শব্দ করতে করতে চোখের কোনা দিয়ে বাচ্চাদের দিকে চোখ রাখছে। ছাদের বেশি কিনারে চলে গেলে সে হালকা হুঙ্কার দিয়ে বলছে, 'কেউ কিনারায় যাবে না, মাঝখানে, সবাই মাঝখানে।'
হুঙ্কার শোনার পর কিছুক্ষণের জন্য সবাই মাঝখানে আসছে, কিছুক্ষণের মাঝে ভুলে গিয়ে আবার কিনারায় চলে যাচ্ছে। মৌটুসি খানিকক্ষণ ছোটাছুটি করে রাতুলের পাশে এসে বসে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'স্পাইডার আংকেল।'
'বল।'
'তুমি কি গান গাইতে পার?'
'নাহ্।'
'পার। পার নিশ্চয়ই পার।' মৌটুসি বলল, 'আমি জানি।'
'তুমি কেমন করে জান?'
'তুমি বলেছ নাহ্! নাহ মানে একটু একটু পারি।'
'তাই নাকি?'
'হ্যাঁ।'
'আর যারা আসলেই গাইতে পারে না তারা কী বলবে?'
'তারা বলবে, না, পারি না!'

মৌটুসির কথা শুনে রাতুল একটু হাসল, বলল, 'ভালোই বলেছ।'
'গাও না আংকেল। একটুখানি। এই এতটুকু।'
রাতুল গিটারে টোকা দিয়ে তার জানা গানের একটা লাইন নিচু গলায় গাইতে মাত্র শুরু করেছে, ঠিক তক্ষুনি ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটল। হঠাৎ করে পুরো জাহাজটি দুলে উঠল, বিকট একটা শব্দ হলো এবং পুরো জাহাজটি থেমে কাত হয়ে গেল। রাতুল শুধু দেখতে পেল জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা বাচ্চাগুলো ছিটকে উপরে উঠে জাহাজের ছাদে আছাড় খেয়ে পড়েছে শুধু একজন– সেটি কে রাতুল জানে না, জাহাজের ছাদ থেকে প্রায় উড়ে গিয়ে সমুদ্রের পানিতে পড়েছে। রাতুল ছুটে গিয়ে দেখল বাচ্চাটি আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে সমুদ্রের নীল পানিতে ডুবে গেল। রাতুল চিন্তা করার জন্য কোনো সময় নিল না। হাতের গিটারটি নিচে ফেলে জাহাজের ছাদ থেকে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পানিতে পড়ে সে ডুবে যায়, হাত-পা নেড়ে তখন সে উপরে উঠতে থাকে, পায়ে জুতো থাকার জন্য সাঁতার কাটতে সমস্যা হচ্ছিল, পা দিয়ে ধাক্কা মেরে সে জুতোজোড়া খুলে ফেলল। দুই হাত দিয়ে পানি কেটে সে উপরে উঠতে উঠতে বাচ্চাটিকে খুঁজতে থাকে, কাউকে খুঁজে পায় না। উপরে একবার মাথাটা বের করে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে চারদিকে তাকাল, জাহাজ থেকে অনেকে চিৎকার করছে কিন্তু তার সেগুলো শোনার সময় নেই। সামনে পানিতে একটুখানি আলোড়ন দেখতে পেয়ে সে আবার ডুব দিয়ে এগিয়ে যায়। স্বচ্ছ পানিতে অনেক দূর দেখা যায়। কিন্তু কোথাও বাচ্চাটির চিহ্ন নেই। রাতুল বুকে সাঁতার কেটে আরও একটু এগিয়ে গেল আর তখন সে বাচ্চাটিকে দেখতে পেল, হাত-পা নাড়তে নাড়তে সে ডুবে যাচ্ছে। রাতুল ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল– বাচ্চাটির এখন বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তাকে টেনে সে উপরে নিয়ে যায়, ধাক্কা দিয়ে পানির উপরে তুলে আনে।
রাতুল শুনতে পেল জাহাজ থেকে সবাই চিৎকার করছে তবে এই চিৎকারটি আতঙ্কের নয়, উল্লাসের। রাতুল বাচ্চাটির দিকে তাকাল, সে এখনও বুঝতে পারছে না কী হয়েছে, খক খক করে কাশতে থাকে তারপর বুক ভরে কয়েকটি নিঃশ্বাস নেয়– তারপর রাতুলকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।
রাতুল এখন বাচ্চাটিকে চিনতে পারল, শান্ত নামের সবচেয়ে দুরন্ত ছেলেটি। এই মুহূর্তে তার মাঝে দুরন্তপনার কোনো চিহ্ন নেই, আর চোখ-মুখে অবর্ণনীয় আতঙ্ক। রাতুল বাচ্চাটিকে ধরে রেখে বলল, 'কোনো ভয় নেই শান্ত, কোনো ভয় নেই। আমি আছি, আমি আছি।'
রাতুল শান্তকে এক হাতে ধরে রেখে সাঁতরে জাহাজের দিকে এগোতে থাকে। তখন সে টের পেল জাহাজটির ইঞ্জিন চলছে, প্রপেলার ঘুরছে কিন্তু জাহাজটি এগোচ্ছে না! সেটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কোনো একটি ডুবোচরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজটি আটকে গেছে।
জাহাজের কাছাকাছি আসার পর অনেকে মিলে প্রথমে শান্তকে তারপর রাতুলকে টেনে তুলল। রাতুল এই প্রথম টের পেল সমুদ্রের পানিটা কনকনে ঠাণ্ডা, সে হি হি করে কাঁপছে। কয়েকজন মিলে শান্তকে ধরে নিয়ে যায়, অন্যরা এগিয়ে এসে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে কথা বলছে, সব কথা সে ভালো করে শুনতে পাচ্ছে না, যেটুকু শুনতে পাচ্ছে তার সবটুকু সে বুঝতে পারছে না। চোখের কোনা দিয়ে সে তৃষাকে খুঁজল, দেখতে পেল না। শামসকে দেখল, তার দামি ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে আসছে। উৎসাহে টগবগ করতে করতে বলল, 'আমি তোমার রেসকু অপারেশনের ফ্যান্টাস্টিক কয়েকটি ছবি তুলেছি। তোমাকে কপি দেব। তুমি তোমার কাছে রাখতে পারবে।'
রাতুল কথার উত্তর দিল না, তার এখন ভেজা

কাপড়গুলো বদলানো দরকার। সমস্যা হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে এসেছে সঙ্গে পরিষ্কার দূরে থাকুক, যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় নেই।
'জাহাজের ওপর থেকে ডাইভ দিয়েছ–' রাতুল শুনল শামস বলছে, 'কত ফিট হবে মনে হয়? তিরিশ ফুট? আমার পারসোনাল রেকর্ড পঁয়ত্রিশ ফুট। আমার ইউনিভার্সিটিতে অলিম্পিক সাইজ সুইমিংপুল আছে সেখানে আমি ডাইভিং প্র্যাকটিস করি।'
রাতুল এবারেও কথা বলল না, সে টের পেতে শুরু করেছে এই মানুষটির কিছু মৌলিক সমস্যা আছে। সে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠতে থাকে। শামসও পিছন পিছন আসে, 'তোমার ই-মেইল অ্যাড্রেস দিও, আমি মেল করে দেব। হাই রিজোলিউশন ছবি, বারো মেগা পিক্সেল।'
রাতুল এবারেও কোনো কথা বলল না। শামস হাসার ভঙ্গি করে বলল, 'এই ছবিগুলো রেখে দিও। তোমার গার্লফ্রেন্ডকে ইমপ্রেসড করতে পারবে।'
রাতুল এবার ঘুরে শামসের দিকে তাকাল, শীতল গলায় বলল, 'আমি আমার গার্লফ্রেন্ডকে ইমপ্রেস করার জন্য ছাদ থেকে পানিতে লাফ দেই নাই। বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য লাফ দিয়েছিলাম। এ ছবিগুলো আপনি আপনার কাছে রেখে দেন। আপনার গার্লফ্রেন্ডকে দেখাবেন আপনি কত সুন্দর ছবি তুলতে পারেন।'
রাতুল যখন শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে হেঁটে গেল তখন শামস দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলল, 'বেয়াদপ ছেলে!' রাতুল অবশ্যি কথাটি শুনতে পেল না।
রাতুলকে সজল একটা ট্রাউজার দিল। গীতি দিল একটা টি-শার্ট। ভেজা কাপড়গুলো শুকোতে দিয়ে রাতুল তার বিছানার চাদরটা গায়ে দিয়ে নিচে গিয়ে দেখতে পেল সেখানে প্রচণ্ড উত্তেজনা। নাট্যকার বাতিউল্লাহ আর কবি শাহরিয়ার মাজিদ প্রচণ্ড ঝগড়া করছেন। ঝগড়াটা শুরু হয়েছে এভাবে : শাহরিয়ার মাজিদ বাতিউল্লাহকে বলেছেন, 'অনেকদিন পর আজকে একটা ভালো কবিতা লিখেছি।'
বাতিউল্লাহ কোনো উত্তর দিলেন না। শাহরিয়ার মাজিদ বললেন, 'প্রত্যেকটা শব্দ সুষম, একটার সাথে আরেকটা সুবিন্যস্ত।'
বাতিউল্লাহ তখনও কোনো কথা বলেননি। শাহরিয়ার মাজিদ বললেন, 'এই জাহাজে আমার কবিতা অনুধাবন করার কেউ নেই। আপনি হয়তো একটু বুঝতে পারবেন। পড়ে শোনাব?'
বাতিউল্লাহ তখন বলেছেন, 'আপনার কবিতা পাকিয়ে সরু পেন্সিলের মতো করে আপনার ইয়ে দিয়ে ঢুকিয়ে দেন।'
তারপরই ঝগড়ার সূত্রপাত। শাহরিয়ার মাজিদ বাতিউল্লাহকে ডেকেছেন অশ্লীল, ইতর, অভদ্র এবং বর্বর। বাতিউল্লাহ শাহরিয়ার মাজিদকে ডেকেছেন উন্মাদ, বালখিল্য, প্রতারক এবং ভুয়া, তার জন্য পুরো জাহাজ ডুবোচরে বাঁকা হয়ে আটকে আছে এবং এখান থেকে কখন তারা ছুটতে পারবেন তার কোনো গ্যারান্টি নাই। বাতিউল্লাহ মনে করিয়ে দিলেন শুধু যে জাহাজ আটকা পড়েছে তা নয়, আরেকটু হলে একটা বাচ্চা পানিতে ডুবে ভেসে যেত। রাতুলকে দেখিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটা ছিল বলে বাচ্চাটি জানে বেঁচে গেছে।'
রাতুল ঝগড়াটা খুবই উপভোগ করছিল কিন্তু সবাই মিলে দু'জনকে আলাদা করে দিল। রাতুল তখন শান্তকে খুঁজে বের করল, দোতলার ডেকে সে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে। মৌটুসি, টুম্পা, টুবলু এবং অন্য সব বাচ্চা তাকে ঘিরে বসে আছে। তৃষাও সেখানে আছে, শান্ত ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছে, তৃষা তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে।
শান্ত ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'বাসায় যাব। আম্মুর কাছে যাব।'
তৃষা বলল, 'এই তো আর একদিন, তারপর বাসায় পৌঁছে যাব।'
শান্ত বলল, 'জাহাজ আটকে গেছে। আমরা আর কোনোদিন বাসায় যেতে পারব না।'
তৃষা বলল, 'কে বলেছে পারব না? শুনছ না জাহাজের ইঞ্জিন চলছে। চেষ্টা করছে ডুবোচর থেকে ছুটিয়ে আনতে?'
'পারবে না। কোনোদিন পারবে না।' শান্ত কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমাদের সারাজীবন এইখানে থাকতে হবে।'
তৃষা বলল, 'না শান্ত। সারাজীবন থাকতে হবে না।'
রাতুল বলল, 'জাহাজের ইঞ্জিন যদি ছোটাতে না পারে তাহলে আমাদের শুধু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। যখন জোয়ার আসবে তখন জাহাজ এমনিতেই ছুটে যাবে।'
শান্ত বলল, 'সত্যি?'
রাতুল হাসল, বলল, 'আমি কি কখনও তোমাদের মিথ্যা বলেছি?'
শান্ত মাথা নাড়ল, বলল, 'না। বল নাই।'
'তাহলে?'
শান্তর মুখে এবারে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে ওঠে। টুম্পা রাতুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্পাইডার আংকেল।'
'বল।'
'তুমি যখন জাহাজ থেকে ডাইভ দিয়েছ আমি সেটা দেখি নাই।'
অন্য সবাই আনন্দে চিৎকার করে ওঠে, 'আমরা দেখেছি! আমরা দেখেছি!'
টুম্পা বলল, 'তুমি আরেকবার ডাইভ দেবে? প্লিজ! প্লিজ! মাত্র একবার।'
রাতুল হাসতে থাকে, 'বলে, ধুর! এত উঁচু থেকে ডাইভ দেওয়া সোজা নাকি?' আর পানি কী ঠাণ্ডা, তাই না শান্ত?'
শান্ত মাথা নাড়ল। টুম্পা বলল, 'শান্তকে তোলার জন্য তো দিয়েছ।'
'তখন কি এতকিছু চিন্তা করেছি নাকি?'
মৌটুসি টুম্পাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, 'তুই যদি পানিতে পড়ে যাস তাহলে স্পাইডার আংকেল আবার ডাইভ দেবে। তাই না আংকেল?'
রাতুল চোখ কপালে তুলে বলল, 'রক্ষা কর। কারও পানিতে পড়ে যাওয়ার দরকার নেই, আমার ডাইভ দেওয়ারও দরকার নেই। পানিতে না পড়েও একশ রকম মজা করা যায়। বুঝেছ?'
তৃষা উঠে দাঁড়াল, রাতুল তখন হাঁটতে শুরু করে। তৃষা পিছন থেকে ডাকল 'রাতুল।'
রাতুল দাঁড়াল, 'কী?'
'থ্যাংক্স রাতুল।'
'কেন?'
'শান্তকে পানি থেকে তুলে আনার জন্য।'
রাতুল কোনো কথা বলল না। তৃষা বলল, 'তুই না থাকলে কী হতো?'
'অন্য কেউ তুলে আনত। এই জাহাজেই অনেক এক্সপার্ট সুইমার আছে তারা অলিম্পিক সাইজ সুইমিংপুলে অনেক উপর থেকে ডাইভ দিতে পারে।'
'কে?'
'তারা আমার মতো ফালতু মানুষও না। তারা সেলিব্রেটি।'
তৃষা কিছুক্ষণ স্থির চোখে রাতুলের দিকে তাকিয়ে থেকে শীতল গলায় বলল, 'রাতুল তুই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? তুই আমাকে খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে পারিস না?'
রাতুল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আই এম সরি তৃষা। আই এম রিয়েলি সরি। আর কখনও তোকে খোঁচা দিব না। আসলে হয়েছে কী–'
'কী হয়েছে?'
রাতুল মাথা নাড়ল, বলল, 'না কিছু না।'
'বল কী হয়েছে।'
'না। বলার মতো কিছু হয়নি। আমি তো একটু গাধা টাইপের মানুষ সেটাই হচ্ছে সমস্যা। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি।'
রাতুল সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে যায়, তৃষা কিছুক্ষণ

দাঁড়িয়ে থেকে নিচে নেমে গেল।
ছাদের এক কোনায় আনসার দু'জন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখে এক ধরনের উদ্বেগের চিহ্ন। রাতুল কাছে গিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার? কিছু হয়েছে?'
কম বয়সী আনসারটি বলল, 'ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না।'
আনসার মানুষটির গলার স্বর শুনে রাতুলের বুকটা কেমন জানি ধক করে ওঠে; জিজ্ঞেস করে 'কী হয়েছে?'
মানুষটি হাত তুলে বহুদূরে দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখেন?'
'কী?' রাতুল কিছু দেখতে পেল না।
'একটা ট্রলার।'
রাতুল এবারে দেখতে পেল। বহুদূরে একটা ট্রলার কালো ধোঁয়া উড়িয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে এই ট্রলারের?'
'এই দিকে আসছে।'
'এই দিকে আসলে কী হবে?'
'ট্রলারে কারা আছে জানি না।'
'কারা আছে মানে? কারা থাকবে?'
আনসার মানুষটি বলল, 'বুঝতে পারছেন না? একটা জাহাজ ডুবোচরে আটকে আছে জাহাজভর্তি বড়লোক মানুষ, তাদের বউ-বাচ্চা! ডাকাতি করার জন্য এর থেকে সোজা জিনিস কী আছে?'
রাতুল চমকে উঠল, 'ডাকাত?'
'হতে পারে।'
'আপনারা আছেন না? আপনাদের রাইফেল আছে না?'
আনসার তার রাইফেলটা হাতে নিয়ে বলল, 'এইটা আসলে রাইফেল না। এইটা হচ্ছে একটা ডাণ্ডা। এইটা দিয়ে মানুষের মাথায় বাড়ি দেওয়া যায়, গুলি করা যায় না।'
'মানে?'
'মানে আবার কী!' আনসার মানুষটা হাত নেড়ে বলল, 'ডাকাতদের কাছে এখন অটোমেটিক রাইফেল থাকে! আমাদের এই রাইফেল দেখে ডাকাতেরা হাসাহাসি করে।'
বয়স্ক আনসারটা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে মুখ খুলল, বলল, 'তুমি খামোখা কেন ভয় দেখাচ্ছ? ডাকাত তো নাও হতে পারে। মাছ ধরা ট্রলার হতে পারে।'
'হতে পারে। আমিও তাই চাই। দোয়া করছি তাই যেন হয়। শুধু বলছি–'
'কী বলছ?'
'বলছি নিশানাটা ভালো লাগছে না। সোজা আমাদের দিকে আসছে।'
মধ্য বয়স্ক আনসারটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার কাঁধ থেকে রাইফেলটা খুলে হাতে নেয়, ম্যাগাজিনটা খুলে ভেতরে দেখে তারপর ম্যাগাজিনটা রাইফেলে লাগিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।
রাতুল দেখল এই শীতের মাঝেও মানুষটা কুলকুল করে ঘামছে। রাতুল হঠাৎ করে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে, তার বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ডটা ধক ধক করে শব্দ করতে থাকে, যদি সত্যিই এটি ডাকাতের ট্রলার হয় তাহলে কী হবে?
ট্রলারটি কাছাকাছি আসার পর হঠাৎ তার ইঞ্জিনটি বন্ধ করে দেয়, নিঃশব্দে সেটা তখন জাহাজের দিকে এগোতে থাকে। একজন মানুষ হাল ধরে আছে, ট্রলারের ছাদে একজন মানুষ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
বয়স্ক আনসারটি দাঁতের ফাঁক দিয়ে চাপা স্বরে বলল, সর্বনাশ! নসু ডাকাত! তারপর হঠাৎ করে রাইফেল তাক করে চিৎকার করে বলল, 'খবরদার জাহাজের কাছে আসবে না। চলে যাও। ইঞ্জিন চালু করে চলে যাও।'
ট্রলারের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটি দাঁত বের করে হেসে বলল, 'কী বলেন ওস্তাদ শুনতে পাই না।'
আনসারটি ধমক দিয়ে বলল, 'খুব ভালো করে শুনতে পেয়েছ আমি কী বলেছি। যাও। যাও এখান থেকে। ভাগো। না হলে কিন্তু গুলি করে দেব।'
'গুলি করবেন? গুলি করবেন কেন? আমি কী করেছি?'
রাতুল দেখল ট্রলারটা ভাসতে ভাসতে একেবারে জাহাজের কাছে চলে এসেছে।
আনসারটা চিৎকার করে বলল, 'খবরদার।' তারপর সত্যি সত্যি রাইফেল তুলে গুলি করল।
ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটা বিদ্যুৎগতিতে লাফিয়ে সরে যায়, হঠাৎ করে হাত পিছনে নিয়ে কোথা থেকে টান দিয়ে একটা কাটা রাইফেল এনে গুলি করতে থাকে, রাতুলের কানের কাছ দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে কিছু একটা ছুটে গেল, তখন সে এক লাফে ছাদে শুয়ে পড়ল। প্রচণ্ড আতঙ্কে সে পরিষ্কার করে কিছু চিন্তা করতে পারছে না।
আনসার দু'জন রাইফেল দিয়ে গুলি করছে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যায় এবং তার মাঝে বয়স্ক আনসারটি হঠাৎ একটা আর্তনাদ করে পেছন দিকে ছিটকে পড়ল। রাতুল দেখল সে ডান হাত দিয়ে কাঁধের কাছে ধরে রেখেছে এবং সেখান দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে।
রাতুল হঠাৎ ধুপ ধাপ শব্দ শুনল এবং পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে ছয়-সাতজন ভয়ঙ্কর দর্শন মানুষ ছাদে লাফিয়ে উঠে এসেছে। মানুষগুলোর সারা শরীর ভেজা, শরীর থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে, তাদের হাতে নানা ধরনের অস্ত্র। বন্দুক হাতে একজন ছুটে এসে কম বয়সী আনসারটার মাথায় আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে কাতর শব্দ করে মানুষটা নিচে পড়ে গেল। ট্রলার থেকে এরা আগেই পানিতে নেমে গেছে, সাঁতরে পিছন থেকে এসে উঠেছে।
রাতুল মাথা তুলে দেখল ট্রলারের ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটিও রেলিং বেয়ে ছাদে উঠে এসেছে, কাটা রাইফেলটা ধরে রেখে সে আনসারদের রাইফেল দুটি নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর বয়স্ক আনসারের কাছে গিয়ে তার মাথায় কাটা রাইফেলটা ধরে বলল, 'ওস্তাদ আমি আপনাকে বলেছিলাম গুলি করবেন না। বলেছিলাম কি-না?'
বয়স্ক মানুষটা তার ক্ষতস্থানটা ধরে রেখে দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল। ডাকাতটা বলল, 'আপনি আমার কথা শুনেন নাই। শুনেছেন?'
বয়স্ক মানুষটা যন্ত্রণায় শব্দ করে মাথা নাড়ল। ডাকাতটা বলল, 'এখন আমি আপনার মাথায় গুলি করি?' হঠাৎ সে ভয়ঙ্কর গলায় চিৎকার করে উঠল, 'করি গুলি?'
বয়স্ক মানুষটা এক ধরনের শূন্য দৃষ্টিতে ডাকাতটার দিকে তাকিয়ে রইল, রাতুলের মনে হলো ডাকাতটা সত্যি সত্যি গুলি করে দেবে। শেষ পর্যন্ত গুলি করল না, উঠে দাঁড়িয়ে মনে হলো প্রথমবার রাতুলকে দেখতে পেল। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কে?'
রাতুল ঢোক গিলে বলল, 'আমি কেউ না।'
'কেউ না আবার কী?'
'না মানে, আমি জাহাজের প্যাসেঞ্জার।'
'জাহাজের প্যাসেঞ্জার ছাদে কী করিস?
'কিছু করি না।'
ডাকাতটা কিছুক্ষণ তার দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর খপ করে তাকে ধরে টেনে দাঁড়া করিয়ে বলল, 'যা নিচে যা। সবাইরে এক জায়গা হাজির হতে বল। একজনও যদি অন্য জায়গায় থাকে তাহলে তোর জান শেষ।' কথা শেষ করে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়।
এই লোকটা নিশ্চয়ই ডাকাতের সর্দার, সে অন্য ডাকাতগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা তোরা জাহাজ দখল নে। কেউ যদি কোনো উনিশ-বিশ করে তাহলে গুল্লি। ঠিক আছে?'
'ঠিক আছে।'
'কেবিনের প্যাসেঞ্জারদেরও নিচে পাঠা, সেইখানে পাহারায়

আশিয়ান শীতলছায়া

থাক দু'জন।'
'ঠিক আছে।'
রাতুল যখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলো দেখল সবাই আতঙ্কিত হয়ে জাহাজের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছে। রাতুলকে দেখে তৃষা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে রাতুল।'
'ডাকাত।'
'আনসার দু'জন কী করছে?'
'একজন গুলি খেয়েছে, অন্যজনকে আটকে ফেলেছে। রাইফেল দুটি নিয়ে গেছে।'
'পুলিশ-কোস্টগার্ডকে কি খবর দেওয়া যায় না?'
কে একজন বলল, 'আমরা সমুদ্রের অনেক ভেতরে। এখানে কোনো নেটওয়ার্ক নেই।'
'এখন কী হবে?'
রাতুল বলল, 'আমি জানি না।'
ঠিক তখন ওরা শুনতে পেল ছাদে দুপদাপ করে কারা দৌড়াচ্ছে, কয়েকটা গুলির শব্দ আর মানুষের চিৎকার শোনা গেল। তারপর দেখল সিঁড়ি দিয়ে আতঙ্কিত মুখে কেবিনের যাত্রীরা নেমে আসছে। শারমিন, তার মা, শামস, আজাদ, বাতিউল্লাহ, অন্যরা এবং সবার শেষে শাহরিয়ার মাজিদ। শাহরিয়ার মাজিদ একটা লুঙ্গি পরে আছেন, লুঙ্গিটা খুলে যাচ্ছিল। কোমরের কাছে হাত দিয়ে ধরে রেখে ভাঙা গলায় বললেন, 'ডাকাইত! জাহাজের মইধ্যে ডাকাইত পড়ছে। ডাকাইত!'
এত বিপদের মাঝেও রাতুল লক্ষ্য করল এই মানুষটা সব সময় শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, কিন্তু এখন এই প্রথমবার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে। এটা হচ্ছে তার সত্যিকারের রূপ– অন্য সময় যেটা দেখে সেটা হচ্ছে ভান।
ঘরের মাঝখানে সবাই একত্র হয়েছে, কেউ একজন হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠল, হাসি এবং কান্না দুটিই মনে হয় সংক্রামক, কান্নার শব্দ শুনে একসাথে অনেকে কেঁদে ওঠে।
রাতুল হঠাৎ লক্ষ্য করল, কেউ তার শার্টের কোনা ধরে টানছে। তাকিয়ে দেখে রাজা। রাতুল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই রাজা গলা নামিয়ে বলল, 'স্যার! আমি কি ডাকাতের দলের সাথে ভাব করার চেষ্টা করমু?'
'ডাকাত দলের সাথে?'
'জে?'
'কেমন করে?'
'আপনি যদি বলেন, তাহলে চেষ্টা করি।'
'তোমার কোনো বিপদ হবে না তো?'
'না স্যার। আমাগো কখনো কোনো বিপদ হয় না।'
রাতুল কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, 'ঠিক আছে।'
রাজা অদৃশ্য হয়ে গেল আর ঠিক তখন বিভিন্ন সিঁড়ি দিয়ে ওপর থেকে ডাকাতগুলো নামতে থাকে। ভেতরে যারা ছিল তারা হঠাৎ করে চুপ করে গেল।
ডাকাতগুলো তাদের বন্দুক নিয়ে বিভিন্ন কোনায় দাঁড়িয়ে যায়, শুধু ডাকাতের সর্দারটি হেঁটে হেঁটে সবার খুব কাছাকাছি আসে। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে থাকা মানুষগুলোর মুখ খুব কাছে থেকে দেখে, তারপর হেঁটে হেঁটে আবার একটু পিছিয়ে যায়। কাছাকাছি একটা প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে আনে কিন্তু সেখানে না বসে সেখানে একটা পা তুলে দাঁড়ায়, তারপর পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচ বের করে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমার নাম নসু। যারা খারাপ লোক তারা আমারে ডাকে নসু ডাকাত! যারা ভদ্রলোক তারা আমারে ডাকে জলদস্যু নসু। আমি আসলে এর কোনোটাই না। আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ, ন্যায্য কথার মানুষ, ন্যায্য কামের মানুষ, ন্যায্য বিচারের মানুষ!'
নসু ডাকাত খুব একটা নাটকীয় ভাব করে সবাইকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এই যে, তোমাদের দিকে তাকিয়ে দেখ। তোমাদের চেহারার কী চেকনাই। গায়ের রং কত সুন্দর, সবাই নাদুস-নুদুস গোলগাল। পোশাক কত সুন্দর। সবাই বড়লোকের বাচ্চা। বাড়িতে এয়ারকন্ডিশন, টেলিভিশন। ফ্রিজের ভিতরে কত রকম খাবার। ব্যাংকভর্তি টাকা। গাড়ি করে ঘুরে বেড়াও। হ্যাঁ। আর আমরা? লেখাপড়া করতে পারি নাই। রোদে পুড়ি, বৃষ্টিতে ভিজি। এক বেলা খাই তো আরেক বেলা না খেয়ে থাকি। আমাদের চেহারা দেখ। দেখ? বল এইটা কোন বিচার? কেন তোমাদের সবকিছু আছে, আমাদের কিছু নাই?'
নসু ডাকাতকে দেখে মনে হলো সে আশা করে আছে কেউ তার এই প্রশ্নের উত্তর দিবে, কেউ কথা বলল না, তখন সে নিজেই বলল, 'সেই জন্যে আমি একটা ন্যায্য বিচারের ব্যবস্থা করেছি। তোমাদের যে বেশি বেশি মালসামান আছে, গয়নাগাটি আছে, টাকা-পয়সা আছে আমি সেইগুলো নিব, নিয়ে একটু ন্যায্য বিচার করব। বুঝেছ?'
কেউ কোনো কথা বলল না।
নসু ডাকাত এবারে একটা হুঙ্কার দিল, 'বুঝেছ?'
এবারে ভয় পেয়ে সবাই মাথা নাড়ে। নসু ডাকাত সন্তুষ্টির মতো শব্দ করে বলল, 'খবরদার কেউ তেড়িবেড়ি করবা না। এই জাহাজ আমার দখলে, সারেং খালাসি গার্ড মাস্টার যা আছে সবাইরে দড়ি দিয়ে বেন্ধে তালা মেরে রেখেছি। জাহাজের বাকি প্যাসেঞ্জার এইখানে। দুইজন আনসার ছিল, তাদের তেজ বেশি। আরে ব্যাটা– মিলিটারি পুলিশ কোস্টগার্ড আমার সাথে পারে না। তুই আনসারের বাচ্চা আনসার আমাকে গুলি করিস? সেই ব্যাটাদের উচিত শিক্ষা হয়েছে। গুলি খেয়ে পড়ে আছে। অচল।' নসু ডাকাত সুর পাল্টে বলল, 'কাজেই তোমরা কোনো ধান্ধাবাজি করবা না। কোনো গোলমাল করবা না। বুঝেছ?'
কেউ কোনো কথা বলল না। নসু ডাকাত বলল, 'সবাই বসে যাও। বস। বস।'
যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল এবার তারা বসে গেল। নসু ডাকাত সন্তুষ্টির একটা ভাব করে বলল, 'চমৎকার। আমি যা বলি তোমরা যদি সেই রকম কাজ কর তাহলে তোমাদের জন্যে ভালো, আমার জন্যেও ভালো। খবরদার কোনো রকম উনিশ-বিশ করবা না, যদি করো আমি কিন্তু সাথে সাথে পাক্কা মেরে সমুদ্রে ফেলে দিব। বুঝেছ?'
কেউ কোনো কথা বলল না। ঠিক সেই সময় রাজা একটা বেঞ্চের তলা থেকে বের হয়ে এলো, সে তার প্যান্ট টি-শার্ট প্যান্টে তার শতচ্ছিন্ন পুরনো ময়লা কাপড় পরে ফেলেছে, মাথায় চুল এলোমেলো, শরীরে কালিঝুলি ময়লা। নসু ডাকাত ধমক দিয়ে বলল, 'কে? কে? বেঞ্চের তলা থেকে কে বের হয়?'
রাজা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ওস্তাদ।'
'তুই কে?'
'আমার নাম রাজা।'
নসু ডাকাত হা হা করে হাসল, 'চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না তুই রাজা। দেখে তো মনে হচ্ছে তুই ফকিরনীর বাচ্চা।'
রাজা দাঁত বের করে হাসল। নসু ডাকাত জিজ্ঞেস করল, 'তুই বেঞ্চের তলায় কী করিস?'
'ঘুমাই ওস্তাদ।' রাজা বসে থাকা সবাইকে দেখিয়ে বলল, 'এই স্যারেরা আমাকে দেখলে খুবই রাগ হয়, বিরক্ত হয়। আমারে মারে। সেই জন্যে স্যার এই চিপার মাঝে শুয়ে থাকি।'
নসু ডাকাত মুখ শক্ত করে বলল, 'বড়লোকের বাচ্চা হচ্ছে হারামির বাচ্চা।'
'জে স্যার। আমারে ঠিক করে খেতেও দেয় না।'
'খেতে দেয় না?'
'না স্যার। কোনো কিছু

আশিয়ান শীতলছায়া

হারানো গেলেই আমারে দোষ দেয়। বলে আমি চুরি করেছি। আমারে মারে।'

এই প্রথম সে একটা কথা বলল, যেটা খানিকটা হলেও সত্যি। শারমিন অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল। নসু ডাকাত চোখ লাল করে বলল, 'কোনজন মারে? আমারে দেখা। লাথি মেরে সমুদ্রে ফেলে দেই।'

রাজা বসে থাকা সবার দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এখন ওস্তাদ চিনতে পারমু না। বড়লোকের ছাওয়ালদের সবাইকে একরকম লাগে।'

নসু ডাকাত বলল, 'সে কথা সত্যি। বড়লোকদের চেহারা এক রকম, স্বভাবচরিত্র এক রকম।'

রাজা বলল, 'ওস্তাদ।'

'কী?'

আমার কথা

'আপনার যদি কিছু লাগে আমারে বলবেন।'

'তোকে বলব? তুই কী করবি?'

'এই ধরেন যদি চা-নাস্তা খেতে চান। এই খানে চা-নাস্তার খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমারে খেতে দেয় না।'

'খা। খা। এখন তুই নিশ্চিন্ত মনে খা। কোনো কিছু চিন্তা নাই।'

'জে। খামু।'

নসু ডাকাত আবার অন্যদের দিকে মন দিল। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা একটা ডাকাতের হাত থেকে একটা বস্তা আর দুইটা পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে বলল, 'এখন আমার লোকজন মালসামান টাকা-পয়সা গয়নাপাতি নেওয়ার জন্যে তোমাদের কাছে যাবে। এই বস্তাটা হচ্ছে মালসামানের বস্তা। মোবাইল ফোন, ক্যামেরা, ঘড়ি, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, বাজনাবাদ্য শোনার ছোটবড় ক্যাসেট প্লেয়ার, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যা আছে সব এই বস্তার মাঝে দিবা। খবরদার কেউ কিছু লুকায়া রাখবা না। যদি আমি টের পাই কেউ কিছু লুকায়া রাখছ সাথে সাথে গুল্লি। মনে থাকবে?'

সবাই মাথা নাড়ল, জানাল যে মনে থাকবে। নসু ডাকাত তখন পলিথিনের দুইটা ব্যাগ তুলে বলল, 'এই দুইটা হচ্ছে সোনাদানা আর টাকা-পয়সার ব্যাগ। মা-বোন তোমরা তোমাদের গয়নাপাতি এখানে দেবে। হাতের চুড়ি, কানের দুল, গলার নেকলেস কিছুই বাদ দেবে না। আজকাল অবশ্যি পুরুষ মানুষেও গয়না পরে। গলায় মালা দেয়, কানে দুল পরে। তোমাদের মাঝে যারা পুরুষ মানুষ গয়না পরে আছ গয়না খুলে দিবা।' নসু ডাকাত তখন আরেকটা ব্যাগ দেখিয়ে বলল, 'এইটা হচ্ছে ক্যাশ টাকার ব্যাগ। যার পকেটে মানি ব্যাগে যত টাকা আছে সব এই ব্যাগে। ঠিক আছে?'

কেউ কোনো কথা বলল না, নসু ডাকাত সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। তিনজন ডাকাত একটা বস্তা আর দুইটা পলিথিনের ব্যাগ নিয়ে জিনিসপত্র, সোনা-গহনা আর মানিব্যাগ থেকে টাকা-পয়সা নিতে শুরু করল। মহিলারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের কানের দুল, হাতের চুড়ি খুলে দিতে লাগলেন, ছোট একটা বাচ্চা মেয়ের গলা থেকে মালাটা খুলে নেয়ার সময় সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শামসের দামি ক্যামেরাটা নেবার সময় ডাকাতগুলো খুশি হয়ে উঠল, নসু ডাকাতকে দেখিয়ে বলল, 'ওস্তাদ! মালদার পার্টি। দামি ক্যামেরা।'

নসু ডাকাত বলল, 'ছবি ওঠে?'

শামস মাথা নাড়ল। নসু ডাকাত জিজ্ঞেস করল, 'ছবি দেখা যায়?'

শামস আবার মাথা নাড়ল। নসু ডাকাত তখন তার কাটা রাইফেলটা ঘাড়ে নিয়ে বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোল আমার ছবি, ভালো না হলে কিন্তু জবাই করে ফেলমু।'

শামস বেশ কয়েকটা ছবি তুলল, নসু ডাকাত ছবিগুলো দেখে বেশ খুশি হলো। শামসের পিঠে থাবা দিয়ে সে ক্যামেরাটা নিয়ে নিজের ঘাড়ে ঝুলিয়ে ফেলল। তাকে তখন অত্যন্ত বিচিত্র দেখাতে থাকে। কবি শাহরিয়ার মাজিদের মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করার সময় আবার একটু ঝামেলা হলো, সেখানে একটা ময়লা পঞ্চাশ টাকার নোট এবং দুইটা বিশ টাকার নোট। ডাকাতটা খেপে গিয়ে বলল, 'আর কিছু নাই?'

শাহরিয়ার মাজিদ মাথা নাড়লেন, 'জে না। নাই।'

'ফকিরনীর পুত! তোর পকেটে একশ টাকাও নাই?'

শাহরিয়ার মাজিদ মাথা নিচু করে বসে রইলেন। ডাকাতটা রাইফেলের গোড়া দিয়ে তাকে মারতে গেল, শাহরিয়ার মাজিদ হাত তুলে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন, 'আপনাগো আল্লাহর কসম লাগে আমারে মাইরেন না। আপনাগো পায়ে ধরি বাজান গো আমারে মাফ করেন। আমি নাদান মানুষ–'

শাহরিয়ার মাজিদের কান্নায় কাজ হলো, ডাকাতটা তাকে ছেড়ে দিয়ে পরের জনের কাছে গেল।

কিছুক্ষণের মাঝেই সবার কাছ থেকে যা কিছু নেয়ার মতো সব নিয়ে নেয়া হলো। ডাকাতগুলো পুঁটলি বেঁধে সেগুলো নিয়ে উপরে উঠে যায়। যাবার আগে চারিদিকের তেরপলের পর্দাগুলো টেনে দিল যেন বাইরে থেকে কেউ ভিতরে দেখতে না পারে।

নসু ডাকাত যাবার আগে উপরে ওঠার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটা হুমকি দিল, 'খবরদার কেউ কোনো রকম উল্টাপাল্টা কাজ করবা না। এইখানে সবাই চুপচাপ বসে থাকবা। কোনো কথাবার্তা নাই, কোনো গোলমাল নাই। আমরা উপরে আছি, যদি শুনি নিচে গোলমাল, কথাবার্তা তাহলে কিন্তু খুন করে ফেলব।'

সবাই চুপ করে রইল। নসু ডাকাত আবার বলল, 'মনে থাকে যেন, আমি কোনো গোলমাল চাই না। ছোট পোলাপানরা যেন ট্যাঁ ফু না করে। আমি কিন্তু পোলাপানদের কান্নাকাটি সহ্য করি না।'

নসু ডাকাত সিঁড়ি দিয়ে আরও দুই পা উঠে আরও একবার দাঁড়াল, বলল, 'এইখানে একজন বন্দুক নিয়ে পাহারায় থাকবে। সাবধান।'

নসু ডাকাতের পিছু পিছু রাজাও উপরে উঠে যাবার চেষ্টা করছিল, অন্য ডাকাতগুলো তাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও নসু ডাকাত হাত নেড়ে তাকে আসতে অনুমতি দিল।

উপরে উঠে রাজা সাবধানে একবার চারদিক ঘুরে এলো। সারেং টিকেট মাস্টার খালাসি সবাইকে হাত-পা বেঁধে বিভিন্ন ঘরে তালা মেরে রেখেছে। কেবিনের প্রত্যেকটা রুম খোলা, ভিতরে সবকিছু তছনছ হয়ে আছে। ডাকাতের দল ডেকের মাঝামাঝি বসে নিজ থেকে

আশিয়ান শীতলহাওয়া

কেড়ে নিয়ে আসা জিনিসপত্র, গয়নাগাটি, টাকা-পয়সা হিসাব করতে বসে।

নসু ডাকাত টাকাগুলো গুনল, গয়নাগুলো হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করার চেষ্টা করল, বস্তার ভিতর হাত দিয়ে মোবাইল টেলিফোনগুলো দেখার চেষ্টা করে না-সূচকভাবে মাথা নেড়ে বলল 'এত বড় একটা জাহাজ দখল করে মাত্র এই অল্প কয়টা জিনিস? পোষালো না।'

নসু ডাকাতের পাশে বসে থাকা কম বয়সী একটা ডাকাত বলল, 'মাছ ধরার ট্রলার লুট করেই তো এর থেকে বেশি পাওয়া যায়।'

'সমস্যাটি কী বুঝেছিস?'

'কী?'

'বড়লোকেরা আজকাল পকেটে ক্যাশ টাকা রাখে না। প্লাস্টিকের একরকম কার্ড আছে, সেইটা দিয়ে টাকা-পয়সার লেনদেন করে।'

কম বয়সী ডাকাত বলল, 'ক্রেডিট কার্ড।'

'হ্যাঁ। ক্রেডিট কার্ড।' নসু ডাকাত গাল চুলকে বলল, 'বড়লোকের বেটিরা রাস্তাঘাটে গয়নাগাটিও পরে না। যদি মনে কর একটা বিয়াবাড়িতে ডাকাতি করতে পারতাম দেখতি তাহলে কী হতো!'

'কিন্তু এইটা তো বিয়াবাড়ি না। এইটা জাহাজ।'

'মালসামান বোঝাই জাহাজ হলে একটা কথা ছিল– খালি জাহাজ!'

ডাকাতগুলো বিরক্ত হয়ে তাদের লুট করা জিনিসগুলো দেখতে থাকে। একজন আনসার গুলি খেয়েছে সেটাও ঝামেলা। পরের কয়দিন পুলিশ কোস্টগার্ড বিরক্ত করবে। যদি মানুষটা মরে যায় তাহলে তো অনেকদিন জঙ্গল থেকেই বের হতে পারবে না।

নসু ডাকাত আবার হতাশভাবে মাথা নাড়ল, না একেবারেই পোষালো না।

কম বয়সী ডাকাতটা বলল, 'ওস্তাদ। বেয়াদপি না নিলে একটা কথা বলি?'

নসু ভুরু কুচকে তাকালো 'কী বলবি?'

'ধরেন এই জাহাজে মালসামান, টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি না থাকতে পারে কিন্তু ধরেন একটা জিনিসের তো অভাব নেই।'

'কী?'

'বড়লোকের সুন্দর সুন্দর বেটাবেটি! ধরেন যদি তার কয়েকটারে ধরে নিয়ে যাই, তারপর যদি বলি বিশ লাখ, পঁচিশ লাখ টাকা না দিলে ছাড়মু না, তাহলেই তো এক কোটি হয়ে যায়।'

নসু ডাকাত তীক্ষ্ণ চোখে কম বয়সী ডাকাতটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'বদি।'

'জে ওস্তাদ।'

'তোর মাথাটা সবার চাইতে পরিষ্কার।'

বদি খুশি হয়ে উঠল, দাঁত বের করে হেসে বলল, 'আপনার দোয়া।'

'একেবারে ফার্স্ট ক্লাস বুদ্ধি।'

'জে।'

'আমাগো কোনো তাড়াহুড়া নাই, কোনো দৌড়াদৌড়ি নাই, খোঁজাখুঁজি নাই। সবগুলা আমাদের জন্যে নিচে অপেক্ষা করছে। আমরা শুধু নিচে যামু, তারপর বেছে বেছে কয়েকটারে তুলে নিয়ে আসমু।'

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কালো মতন একজন ডাকাত বলল, 'সুন্দর সুন্দর মেয়েলোক দেখে–'

নসু ধমক দিল, 'চোপ থাক কাউলা। খালি সুন্দর সুন্দর মেয়ে! সুন্দর সুন্দর মেয়ে। টাকা দিলে আমার কাছে সবই সুন্দর।'

কম বয়সী ডাকাত বদি বলল, 'জোয়ার শুরু হতে ধরেন এখনও এক ঘণ্টা। আমাদের হাতে অনেক সময়।'

নসু বলল, 'কিন্তু বড়লোকের বেটাবেটি ধরে আনার জন্যে দেরি করে লাভ নাই। টাকা-পয়সা গয়নাগাটি ভয়ের চোটে দিয়ে দেয়, আপত্তি করে না। কিন্তু ছেলেপিলে কেড়ে নিতে হলে মনে হয় বাধা দিতে পারে।

কালো মতন ডাকাত কাউলা বলল, 'আমাগো সবার হাতে বন্দুক। বাধা দিবি মানে? গুলি করে দুইটা লাশ ফেলে দিলেই সব ঠাণ্ডা।'

নসু বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখ কাউলা। লাশ যদি ফেলতে হয় দুইটা কেন আমি দুই ডজনও ফেলতে পারি। কিন্তু লাশ মানেই ঝামেলা। ভয় দেখা, মাইরপিট কর কিন্তু দরকার না হলে লাশ ফেলবি না।'

'ঠিক আছে।'

বদি জানতে চাইল, 'তাহলে কী ঠিক হলো ওস্তাদ?'

নসু ডাকাত বলল, 'চল, এখন নিচে যাই। তারপর যে কটা দরকার ধরে আনি।'

'ধরে এনে রাখব কোথায়?'

'সোজা ট্রলারে। ট্রলারের ঝাঁপ ফেলে দে। নিচে বেঞ্চে ফেলে রাখব। গামছা দিয়ে মুখ বেন্ধে রাখবি। চোখ বেন্ধে রাখবি।'

ডাকাতগুলো মাথা নাড়ল। বলল, 'জে আচ্ছা।'

নসু বলল, 'চল যাই।'

বদি বলল, 'যাবার আগে এক কাপ চা খেয়ে শরীলটা গরম করে নিই। ওস্তাদ?'

'চা। চা কোথায় পাবি?'

'নিচে ব্যবস্থা আছে। তাই না রে রাজা?'

রাজা একজন ডাকাতের ঘাড়, হাত-পা টিপে দিচ্ছিল। সে মাথা নাড়ল। বলল 'জে ওস্তাদ আছে।'

'যা নিচে যা, সাত কাপ চা নিয়ে আয়।'

'সাথে আর কিছু? বিস্কুট, কলা?'

'যা আছে নিয়ে আয়।'

রাজা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে ওস্তাদ।'

রাতুল চমকে উঠে বলল, 'কী বলছ? জিম্মি নেবে?'

রাজা এদিক-সেদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'জে বাই। সুন্দর সুন্দর দেখে মেয়েছেলে ট্রলারে তুলে নিয়ে যাবে।'

'সর্বনাশ।'

'জে বাই। সর্বনাশ। আমারে চা আনতে বলেছে। চা খেয়েই নিচে নামবে।'

রাজা কোনো কথা বলল না। রাতুল বুকের ভেতর কেমন এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে। যখন তাদের টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র নিয়েছে তখন কেউ আপত্তি করেনি। যদি এখান থেকে মেয়েদের তুলে নেয় তখন তো চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়– তাদের বাধা দিতে হবে। তখন কী হবে?

তখন গোলাগুলি হবে? তাদের কেউ গুলি খাবে? মারা যাবে? রাতুল পরিষ্কার করে কিছু চিন্তা করতে পারছে না। সব মিলিয়ে সাতজন ডাকাত– সবার কাছেই এখন বন্দুক না হয় রাইফেল। মানুষগুলো ভয়ঙ্কর, খালি হাতেই ভয়ঙ্কর। হাতে অস্ত্র থাকলে এরা আরও একশ' গুণ ভয়ঙ্কর হতে পারে।

রাজা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করব, ভাই?' সে একটু আগে উপর থেকে নিচে নেমে এসেছে। নিচে সবার চুপচাপ বসে থাকার কথা। তারপরও সে সাবধানে রাজার সাথে কথা বলছে। আশপাশে কেউ নেই কিন্তু সবাই তাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই বুঝে গেছে কিছু একটা বিপদ আসছে।

রাতুল বলল, 'তুমি চা বানাতে শুরু কর। আমি আসছি।'

রাতুল তখন খুব সাবধানে, প্রায় নিঃশব্দে নাট্যকার বাতিউল্লাহর কাছে গেল। পাশে বসে গলা নামিয়ে বলল, 'স্যার। আপনার পকেটে ঘুমের ট্যাবলেটগুলো আছে না?'

'হ্যাঁ আছে। কেন?'

'আমাকে দেন।'

আশিয়ান শীতলহায়া

'কী করবে?'
'এখন প্রশ্ন করবেন না স্যার, আমাকে দেন।'
'তুমি কী করবে? পরে আমি বিপদে পড়ব।'
'আমরা সবাই বিপদের মাঝে আছি। এর থেকে বেশি বিপদের মাঝে পড়া সম্ভব না।'
বাতিউল্লাহ খুব অনিচ্ছার সঙ্গে ট্যাবলেটগুলো বের করলেন। রাতুল সাবধানে হাতে নিয়ে বলল, 'কয়টা খেলে একজন খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বে?'
'সেটা মানুষের সাইজের উপর নির্ভর করে।'
'সাধারণ সাইজ।'
'দুইটা। দশ মিনিটে আউট হয়ে যাবে।'
'ওষুধের কোনো গন্ধ আছে? স্বাদ?'
'থাকবে না কেন? যে কোনো ওষুধের গন্ধ থাকে, স্বাদ থাকে।'
'বেশি, না কম?'
'বেশি-কম এই শব্দগুলো খুবই আপেক্ষিক।'
'আহ!' রাতুল বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাড়াবাড়ি কিছু আছে কি না–'
'মনে হয় নাই। কিন্তু লং টাইম রি-অ্যাকশান–'
রাতুল আর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করল না। সাবধানে রাজার কাছে হাজির হলো। রাজা সাত কাপ চা তৈরি করেছে। রাতুল বলল, 'আট কাপ বানাও।'
'আরেকটা কেন?'
'তোমার জন্য। তুমিও খাবে।'
'কেন?'
রাতুল দুটো দুটো ট্যাবলেট গুঁড়ো করে চায়ের কাপে দিয়ে বলল, 'ওদের বিশ্বাস করানোর জন্যে। এগুলো ঘুমের ওষুধ, দশ মিনিটের মাঝে ঘুমিয়ে পড়বে।'
রাজার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'সত্যি'!
'হ্যাঁ। যদি খাওয়াতে পার।'
'আমি খেলে আমিও ঘুমিয়ে পড়ব?'
'হ্যাঁ। কাজেই তুমি খাবার ভান করবে। এক-আধ চুমুক খাবে, বেশি না।'
'ঠিক আছে।'
রাতুল এদিক-সেদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'তারা যদি ওষুধের গন্ধের কথা বলে তাহলে বলবে, পানি বিশুদ্ধ করার ট্যাবলেট দিয়ে আমরা পানি খাই। সেই জন্যে পানিতে ক্লোরিনের গন্ধ। বুঝেছ?'
'বুঝেছি। ক্লোরিন?'
'হ্যাঁ, ক্লোরিন।'
রাতুল তখন বাক্স থেকে নতুন বিস্কুটের প্যাকেট বের করে দিল, কলা দিল, চানাচুরের প্যাকেট দিল। দিয়ে বলল, 'যাও। এখন সবকিছু নির্ভর করছে তোমার উপর। যদি বুঝতে পারে ঘুমের ওষুধ দিয়ে চা এনেছ তাহলে তোমাকে কিন্তু খুন করে ফেলবে।'
'জানি।'
'ভয় করছে?'
'না। আমার ভয় করে না।' রাজা দাঁত বের করে হাসল, 'আমার মা আমার মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দিয়েছে, আমার কখনো বিপদ হবে না।'
রাতুল একটু হিংসা অনুভব করে, রাজার মতো সেও যদি বিশ্বাস করতে পারত যে তার কখনো কোনো বিপদ হবে না!
রাজা চায়ের কাপ, বিস্কুট, কলা, চানাচুর সবকিছু ডেকের ওপর রাখল। সাথে সাথে ডাকাতগুলো গোগ্রাসে খেতে শুরু করে। কয়েকজন চায়ের কাপ টেনে নিয়ে চুমুক দেয়। রাজা চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ্য করে, একজন একবার ভুরু কুঁচকে চায়ের দিকে তাকাল। তারপর আবার চুমুক দিল। তারপর খেতে থাকল।
নসু ডাকাত চায়ে চুমুক দিয়েই ভুরু কুঁচকে বলল, 'চায়ে ওষুধের গন্ধ কেন?'
'পানি।' রাজা হড়বড় করে বলল, 'এরা পানির মাঝে ওষুধ দিয়ে খায়, সেই ওষুধের গন্ধ।'
'কিসের ওষুধ?'
'পানি বিশুদ্ধ করার ওষুধ। একজনের পেটের অসুখ হয়েছিল, তখন থেকে পানিতে এই ওষুধ দেয়। পানির মাঝে ওষুধের গন্ধ।'
নসু ডাকাত আবার চায়ের কাপটা শুঁকে মাথা নেড়ে রেখে দিল। রাজা জিজ্ঞেস করল, 'খাবেন না ওস্তাদ?'
'নাহ।'
'আমি আপনারটা খাই?'
'খাবি? খা। ওষুধের গন্ধওয়ালা চা যদি খেতে চাস, তাহলে খাবি।'
'আমার অভ্যাস হয়ে গেছে' বলে রাজা চায়ের কাপ নিয়ে শব্দ করে চুমুক দিল। চাটা খেলো না, মুখে রেখে দিয়ে পরের বার চুমুক দেয়ার সময় বের করে দিল।
সাতজন ডাকাতের মাঝে শুধু চারজন চা খেলো। নসু ডাকাত গন্ধের জন্যে খেলো না। বদি আর কালো মতন ডাকাতটা চা খাওয়ার চেষ্টা করল না। তারা নাকি চা খায় না।
চা-নাস্তা খেয়ে ডাকাতগুলো উঠে দাঁড়াল। কাটা রাইফেলটা একবার পরীক্ষা করে নসু ডাকাত বলল, 'আয় যাই।'
সিঁড়ি দিয়ে যখন সাতজন ডাকাত নেমে এলো তখন নিচে আবার একটা ভয়াবহ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যারা নিচু গলায় কথা বলছিল তারা সবই কথা বন্ধ করে থেমে গেল। রাতুল রাজার দিকে তাকাল, সে পিছনে পিছনে নেমে এসেছে। রাজা সাবধানে চারটা আঙুল দেখাল, রাতুল অনুমান করে নেয় চারজন চা খেয়েছে। তার মানে তিনজন খায়নি। তার মানে তিনজন ভয়ঙ্কর ডাকাত এখনও রয়ে গেছে। রাতুল বুকের ভিতরে এক ধরনের আতঙ্ক অনুভব করে। সে ডাকাতদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল কারা ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু বুঝতে পারল না। ওষুধের কাজ হতে আরও সময় নেবে মনে হয়।
নসু ডাকাত ঘ্যাস ঘ্যাস করে তার গাল চুলকে না-সূচকভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'নাহ। পোষালো না। এত বড় একটা জাহাজ, এতগুলো বড়লোক মানুষ– মালসামান, গয়নাগাটি, টাকা-পয়সা গুনে দেখি কিছুই না। মনে হয় সব ফকিরনির পুত জাহাজে উঠে এসেছে।'
হঠাৎ করে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। নসু ডাকাত দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'এত কম টাকায় আমি রাজি না। আমি তাই তোদের কয়টাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। বিশ লাখ করে টাকা দিলে আমি ছেড়ে দেব।'
'মাত্র বিশ লাখ!'
নিচে বসে থাকা সবাই আতঙ্কের একটা চিৎকার করল। নসু ডাকাত সাথে সাথে তার বন্দুকটা উঁচু করে বলল, 'খবরদার। একটা কথা না।'
জাহাজের নিচে আবার নৈঃশব্দ্য নেমে আসে। নসু ডাকাত নিচে বসে থাকা আতঙ্কিত মানুষগুলোর দিকে তাকায়। তার প্রথম পছন্দ হলো শারমিনকে। আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'এইটা।'
শারমিন, তার সাথে অনেকে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। নসু ডাকাত চিৎকার করে বলল, 'খবরদার, কোনো শব্দ না। খুন করে ফেলব।'
শারমিনের মন তবুও চিৎকার করে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। দু'জন ডাকাত গিয়ে শারমিনের দুই হাত ধরে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসে। নসু ডাকাত এরপর পছন্দ করল গীতিকে– সবার শেষে তৃষাকে। দু'জন দু'জন করে ডাকাত এক একজনকে ধরে

টেনেহিঁচড়ে নিতে থাকে। রাতুল শেষ মুহূর্তে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল। নসু ডাকাত তখন তার কাটা রাইফেলের বাঁট দিয়ে রাতুলের মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। রাতুল হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল, পারল না। মাথা ঘুরে সে নিচে পড়ে গেল।

কিছুক্ষণের মাঝে সে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের খুব বড় বিপদ। আমাদের তিনজনকে ধরে নিয়ে গেছে। এটা হতে পারে না।'

আলমগীর ভাই বললেন, 'হতে পারে না মানে কী? হয়ে গেছে।'

'এখনো হয়নি।'

'তুমি কী বলতে চাইছ?'

'আমাদের হাতে এখনও একটু সময় আছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে।'

শামস বলল, 'তোমার মাথা খারাপ? ওদের কাছে কত রকম আর্মস দেখেছ? এখনও তো কেউ মারা যায়নি। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কেউ না কেউ গুলি খাবে। কেউ না কেউ মারা যাবে।'

'তার মানে আমরা আমাদের তিনজন মেয়েকে ধরে নিয়ে যেতে দেব?'

'কী করবে তা না হলে। যত তাড়াতাড়ি আমরা ফিরে গিয়ে র‍্যানসামের টাকা দিতে পারব–'

রাতুল শামসের সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়ার কোনো উৎসাহ পেল না। সে অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কয়েকজন ভলান্টিয়ার দরকার।'

সজল জিজ্ঞেস করল, 'কেন? কী করতে হবে?'

'আমি আমার প্ল্যানটা বলি। সব মিলিয়ে ডাকাত হচ্ছে সাতজন। এর মাঝে আমরা চারজনকে ডাবল ডোজ ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে পেরেছি। তাই না রাজা?'

রাজা মাথা নাড়ল, 'জে। চারজন।'

আলমগীর ভাই চমকে উঠে বললেন, 'কী বললে? ঘুমের ওষুধ খাইয়েছ? কেমন করে?'

'চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে। আমাদের রাজা করেছে। তার মানে আর দশ মিনিটের মধ্যে চারজন ঘুমিয়ে পড়বে। বাকি থাকল তিনজন। এক সাথে তিনজনের সাথে ফাইট করা যাবে না। কিন্তু একজন একজন করে হলে সম্ভব।'

শামস আবার বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? তারা আর্মড–।'

রাতুল শামসের কথা পুরোপুরি উপেক্ষা করে বলল, 'রাজা উপর থেকে ভুলিয়েভালিয়ে একজন করে নিচে আনবে, আমরা তাকে সবাই মিলে ধরব। আমাদের পক্ষে কাজ করবে দুটো জিনিস। এক, আমরা অনেকেই আছি। দুই, ওরা মোটেও জানে না যে আমরা এটা করব। সারপ্রাইজ ভ্যালু।'

শামস বলল, 'আমি এ সবের মাঝে নেই। তুমি তোমার নিজের লাইফকে রিস্কের মাঝে ফেলতে চাও সেটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু তুমি আমাদের লাইফকে বিপদে ফেলবে– সেটা আমি হতে দেব না।'

সজল বলল, 'রাতুল আমি রাজি।'

শান্ত বলল, 'আমি রাজি স্পাইডার আংকেল।'

সাথে সাথে অন্য সব বাচ্চা হাত তুলে বলল, 'আমরা রাজি। আমরা রাজি।'

রাতুল মুখে আঙুল দিয়ে বলল, 'শামস... কোনো শব্দ না। ভেরি গুড। বাচ্চারা হলে আরো ভালো, সারপ্রাইজটা আরও বেশি হবে। এখন আমি বলি আমাদের কী করতে হবে।'

রাতুল গলা নামিয়ে ওদেরকে তার পরিকল্পনাটা বোঝাতে থাকে।

রাজা উপরে উঠে দেখল, যে চারজন ঘুমের ওষুধ খেয়েছে তারা কেমন যেন জবুথবু হয়ে বসে আছে। মেয়ে তিনজন ট্রলারের ভেতর বাঁধা। বদি বস্তার ভেতরে জিনিসগুলো বাঁধছে, রাজা তার কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'ওস্তাদ, আপনার সাথে একটা জরুরি পরামর্শ করতে পারি? গোপনে।'

বদি দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'আমার সাথে? গোপনে?'

'জে।' রাজা ষড়যন্ত্রীর মতো মুখ করে বলল, 'কেউ যেন টের না পায়।'

'কী পরামর্শ? বলো?'

'আপনি যদি কিরা কাটেন– কাউরে বলবেন না, তাহলে আপনারে বলব।'

বদি রাজার মাথায় চাঁটি মেরে বলল, 'বদমাইশের বাচ্চা। তোর সাহস তো কম নয়! আমারে বলিস কিরা কাটতে!'

'আমি পুরা ব্যাপারটা বললেই আপনি বুঝবেন ওস্তাদ। শুধু বলেন, আমারে একটু ভাগ দিবেন।'

বদি এবারে চোখ সরু করে বলল, 'কিসের ভাগ?'

'কাউরে বলবেন না তো? খালি আমি আর আপনে।'

'ঠিক আছে।'

'খোদার কসম?'

বদি বিরক্ত হয়ে রাজার মাথায় আরেকটা চাঁটি দিয়ে বলল, 'বল কী বলবি? তোর জন্যে আমি কসম-কিরা কাটব? বেকুব কোথাকার!'

রাজা গলা নামিয়ে বলল, 'নিচে একজন স্যারের কাছে এই রকম টাকার একটা বান্ডিল। মাদুরের তলায় লুকায়া রাখছে। সব পাঁচশ' টাকার নোট।'

'সত্যি!' বদির চোখ লোভে চক চক করে ওঠে।

'জে ওস্তাদ। আপনি নিচে আসেন, আমি দেখায়া দেই।'

বদি এক মুহূর্ত চিন্তা করল, নসু ডাকাতকে কিছু না বলে এতগুলো টাকা নিজে নেয়াটা বিপজ্জনক। কিন্তু এই রকম সুযোগ আর কখন পাবে? বদির যুক্তি-তর্ক লোভের কাছে হার মানল। সে রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল যাই।'

রাজা বদিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে একটু যেতেই দেখা গেল বাচ্চারা গায়ে গায়ে লাগিয়ে বসে আছে। রাজা তাদের ভেতর দিয়ে জায়গা করে এগিয়ে যেতে যেতে গলা নামিয়ে বলল, 'ঐ যে মোটা মতন ফর্সা মানুষটা দেখছেন–'

রাজা তার কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই হঠাৎ করে একসাথে সব বাচ্চা বদির পা ধরে হ্যাঁচকা টান দেয় আর সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। সাথে সাথে বিদ্যুৎ গতিতে সবাই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ কিছু বোঝার আগে একজন টান দিয়ে তার বন্দুকটা কেড়ে নেয়। একজন মুখের মধ্যে একটা কাপড় গুঁজে দেয় যেন শব্দ করতে না পারে। অন্যরা তাকে চেপে ধরে রাখে।

কে কী করবে আগে থেকে ঠিক করে রাখা ছিল। সবাই নিখুঁতভাবে তার দায়িত্ব পালন করল। আর দুই মিনিটের মধ্যে দেখা গেল বদি ডাকাতকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়েছে।

শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'এখন এই ডাকাতকে কী করব স্পাইডার আংকেল?

রাজা বলল, 'বাইরে পানির মাঝে ফালায়া দেন। মারবেলের মতো টুপ করে ডুবে যাবে! ফিনিশ।'

রাজার প্রস্তাব শুনে বদি ডাকাত চমকে ওঠে। তার কিছু করার নেই। একটু নড়াচড়া করেই প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। রাতুল বন্দুকটা হাতে নিয়ে বলল, 'খবরদার। যদি নড়াচড়া কর, আসলেই পানিতে ফেলে দিব।'

বদি ডাকাত নড়াচড়া বন্ধ করল। জাহাজের মাঝখানে একটা ডালার মতো আছে। সেটা খুললে জাহাজের খোলটা দেখা যায়। যখন অনেক মালপত্র আনতে হয় তখন সেটাতে ভর্তি করে আনা হয়। এখন সেটা খালি। কিছু তেলের ড্রাম, বাক্স এবং জঞ্জাল পড়ে আছে। সবাই মিলে ধরাধরি করে এনে বদি

আশিয়ান শীতলছায়া

ডাকাতকে তার ভেতরে ফেলে দিয়ে ডালাটা বন্ধ করে দিল। রাতুল রাজাকে বলল, 'এখন যাও। আরেকজনকে নিয়ে এসো। পারবে না?'

রাজা দাঁত বের করে বলল, 'পারুম স্যার।'

ওপরে উঠে দেখা গেল চারজন ডাকাত ঘুমে ঢলে পড়ে গেছে। কালো মতন ডাকাতটা, যাকে নসু ডাকাত কাউলা বলে ডেকেছে সে বেশ অবাক হয়ে ঘুমিয়ে থাকা ডাকাতগুলোকে জাগানোর চেষ্টা করছে। নসু ডাকাত নেই। মনে হয় ট্রলারে আছে।

রাজা গিয়ে কাউলা ডাকাতকে ডাকল, 'ওস্তাদ।'

কাউলা ঘুরে রাজাকে দেখে কেমন যেন ক্ষেপে উঠল। দাঁত-মুখ খিচিয়ে বলল, 'দূর হ হারামজাদা।'

রাজা গালাগালি গায়ে মাখল না। বলল, 'ওস্তাদ আপনার সাথে একটা গোপন কথা।'

'তোর সাহস তো কম না! আমার সাথে গোপন কথা!'

'শুনলে আপনি তাজ্জব হয়ে যাবেন ওস্তাদ।'

কাউলা মুখ খিচিয়ে ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ থাক।' তারপর একটা অশ্লীল গালি দিল।

রাজা বুঝতে পারল, কাউলাকে টাকার লোভ দেখিয়ে নেওয়া যাবে না। তার সাথে কথাই বলতে চাইছে না। রাজা তখন সরাসরি তার দুই নম্বর পরিকল্পনায় চলে গেল। কাউলার কাছাকাছি এসে সে তার মুখে এক দলা থুথু ফেলে দিল।

ফল হলো ভয়ঙ্কর। কাউলা রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে রাজাকে ধরার চেষ্টা করল। রাজা প্রস্তুত ছিল। সে জানে, যদি এখন কাউলা, ডাকাত তাকে ধরতে পারে তাহলে তারা মাথা টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। তাই সে লাফ দিয়ে সরে গেল। শুধু যে সরে গেল তা-ই না, একটু দূরে সরে গিয়ে কাউলার দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে দিল। কাউলা তখন লাফিয়ে উঠে রাজাকে ধরতে চেষ্টা করে। রাজা প্রাণপণে ছুটতে থাকে। তার পিছু পিছু কাউলা ছুটে আসে।

সিঁড়ি দিয়ে রাজা নেমে যায়। কাউলা কোনো কিছু চিন্তা না করে তার পিছু পিছু ছুটে আসে। বাচ্চাদের গায়ের ওপর পা দিয়ে সে ছুটে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই সব বাচ্চা তার পা ধরে ফেলে। কাউলা তাল সামলাতে না পেরে ধড়াম করে পড়ে যায়। সাথে সাথে অন্যেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বদি ডাকাতকে যত সহজে আটকানো গিয়েছিল কাউলাকে এত সহজে আটকানো গেল না। তার শরীরে মোষের মতো জোর। একেকটা ঝটকা দিতেই একেকজন কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল। তার পরেও তারা তাকে ছাড়ল না। রাতুল বন্দুকের বাঁট দিয়ে তার মাথার পিছনে জোরে একটা আঘাত করার পর সে শেষ পর্যন্ত নিস্তেজ হয়ে হাল ছেড়ে দিল।

এবারে দ্রুত তার মুখে কাপড় গুঁজে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। তারপর পাটাতনের ডালা খুলে তার ভেতরে তাকেও ফেলে দিল।

রাতুল ঘুরে তাকিয়ে দেখল বাচ্চাদের অনেকেই ব্যথা পেয়েছে। মৌটুসির নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, শান্তর কপালের কাছে আলুর মতো ফুলে আছে। জামাকাপড় ছেঁড়া, চুল এলোমেলো। কিন্তু সবাই উত্তেজিত।

রাতুল দুই হাতে দুইটা বন্দুক নিয়ে বলল, 'সাতজনের ভেতর ছয়টাকেই আমরা কাবু করে ফেলেছি। এখন বাকি একটা। আমাদের কাছে বন্দুক দুইটা। ওপরে গেলে আরও পাব। রাতুল রাজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাব না রাজা?'

'জে। চাইরটা। বন্দুক আর কাটা রাইফেল।'

'গুড। তার মানে আমাদের সব মিলিয়ে ছয়জন ওপরে যাব। ছয়জনের হাতে ছয়টা বন্দুক। সর্দারটাকে কাবু করা কঠিন কিছু হবে না। দরকার হলে গুলি করে দেব। ঠিক আছে?'

অবস্থা মোটামুটি আয়ত্তের মধ্যে চলে এসেছে দেখে এবারে অনেকেই ওপরে যেতে রাজি। শুধু শামস বলল, 'তোমরা কেউ কখনো বন্দুক দিয়ে গুলি কর নাই। দরকার হলেও গুলি করতে পারবে না। ঐ ডাকাতটা গুলি করতে পারে, সবাইকে শেষ করে দিবে।'

রাতুলের পরিকল্পনা এতক্ষণ নিখুঁতভাবে কাজ করেছে। তার ওপরে এবারে সবার বিশ্বাস জন্মে গেছে। কাজেই শামসের কথা শুনে কেউ ভয় পেল না। আলমগীর ভাই পর্যন্ত বন্দুক হাতে নিয়ে নসু ডাকাতকে ধরতে রাজি হয়ে গেলেন।

প্রথমে রাজা সাবধানে উঠে চারদিক দেখেশুনে বন্দুকগুলো টেনে সিঁড়ির কাছাকাছি এনে রাখে। নসু ডাকাত ট্রলারে কিছু একটা করছে। কাজেই এখনই সময়। প্রথমে রাতুল তারপর অন্য সবাই একজন একজন করে ওপরে উঠে যায়। সবাই একটা করে বন্দুক নিয়ে একটু আড়ালে চলে গেল। নসু ডাকাত যখন ওপরে উঠে আসবে তখন তাকে ঘেরাও করে ফেলা হবে। বন্দুক নিয়ে সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকে।

নসু ডাকাত জাহাজে সবকিছু তুলে তার দলের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। জোয়ার এখনও শুরু হয়নি, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। এখন রওনা দেওয়া যায়। সে সবার জন্যে অপেক্ষা করছে কিন্তু কেউ আসছে না দেখে একটুখানি অবাক এবং অনেকখানি বিরক্ত। সে কয়েকবার চিৎকার করে ডাকল। কেউ তার সাড়া দিল না। তখন সে হঠাৎ একটু দুশ্চিন্তিত হয়ে যায়। কাটা রাইফেলটা ধরে সে তখন সাবধানে জাহাজে উঠে আসে। আর হঠাৎ সে অবাক হয়ে দেখল ছয় জন তার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছে। রাতুল চিৎকার করে বলল, 'হ্যান্ডস্ আপ।'

নসু ডাকাতের মুখটা দেখতে দেখতে ভয়ংকর হয়ে উঠল। বলল, 'আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ। ইংরেজি বুঝি না। কী বললা?'

হাতের রাইফেলটা নিচে ফেলে হাত তুলে দাঁড়াও।

'যদি না দাঁড়াই তাহলে কী করবা?'

'গুলি করে দেব।'

'গুলি করবা? তুমি?' নসু ডাকাত হা হা করে হাসল এবং কিছু বোঝার আগে হঠাৎ সে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসে রাজাকে ধরে তার মাথায় কাটা রাইফেলটা ধরে বলল, 'তোমরা গুলি করবা না, আমি জানি। আমি কিন্তু গুলি করমু। সবার হাতের বন্দুক নিচে ফেল। তা না হলে এই হারামজাদা পোলার মাথার ঘিলু বের হয়ে যাবে।'

হঠাৎ পুরো পরিবেশটা পাল্টে যায়। নসু ডাকাত চিৎকার করে বলল, 'বন্দুক নিচে ফেল, নইলে গুলি করমু।'

রাজার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে। সেখানে অবর্ণনীয় এক ধরনের আতঙ্ক। একজন একজন করে সবাই তাদের হাতের বন্দুক আর রাইফেল নিচে নামিয়ে রাখে। নসু ডাকাত তখন রাজার মাথায় কাটা রাইফেলটা ধরে রেখে আস্তে আস্তে পিছিয়ে গিয়ে ট্রলারটাতে ওঠে। ট্রলারের দড়িটা খুলে সেটাকে মুক্ত করে নেয়। ইঞ্জিনটাকে চালু করে তারপর ট্রলারটা চালিয়ে নিতে থাকে।

অন্য সবার সাথে রাতুল হতবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে দেখতে পেল নসু ডাকাত রাজার মাথায় রাইফেল ধরে রেখে শারমিন, গীতি আর তৃষাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। রাতুল পুরো ব্যাপারটা চিন্তাও করতে পারছে না। চিন্তা করার জন্য সে অপেক্ষাও করল না। নসু ডাকাত যখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে সে তখন পানিতে ঝাঁপ দিল। পানিতে তলিয়ে গেল প্রথমে। সাঁতরে সে উপরে উঠতে উঠতে ট্রলারের দিকে এগিয়ে যায়। ট্রলারটা ঘুরছে। সে জন্যে সে খানিকটা সময় পেয়ে গেল। এক সময় সে ভালো সাঁতার কাটতে পারত। ঢাকা শহরে থেকে সে পানিতে নামেনি বহুদিন। সমুদ্রের কনকনে শীতল লোনাপানিতে আবার সে প্রাণপণে সাঁতার কেটে ট্রলারটাকে ধরে ফেলল। ট্রলারটা এবার বেশ দ্রুত চলতে শুরু করেছে। রাজা নিজেকে টেনে উপরে তুলল। দেখতে পেল শারমিন, গীতি আর তৃষাকে

তৃষাকে বেঁধে রেখেছে। তাদের চোখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা বলে তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। রাতুল সাবধানে পিছন দিয়ে ওপরে উঠল। রাজাকে ট্রলারের ছাদে শুইয়ে রেখে পা দিয়ে তাকে চেপে ধরে রেখেছে। এক হাতে কাটা রাইফেল অন্য হাতে হাল ধরে ট্রলার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নসু ডাকাত তাকে দেখছে না, রাজা তাকে দেখতে পেল আর সাথে সাথে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। রাতুল নিঃশব্দে রাজাকে ইঙ্গিত দিল। তারপর দুজন একসাথে নসু ডাকাতকে আক্রমণ করল। রাজা হ্যাঁচকা টানে রাইফেলটা টেনে নিয়ে তার দু'পা দিয়ে নসু ডাকাতের দুই পায়ের ফাঁকে প্রচণ্ড একটা লাথি মারে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাতুল তার সর্বশক্তি দিয়ে নসু ডাকাতের মুখে একটা ঘুষি মারল। নসু ডাকাত অবাক হয়ে পিছনে তাকাতেই রাতুল আবার সর্বশক্তি দিয়ে তার মুখে আরেকটা ঘুষি মারল। হাল থেকে হাতটা ছুটে যেতেই ট্রলারটা ঘুরে যায়। আর তাল হারিয়ে নসু ডাকাত পানিতে পড়ে যায়।

রাজা তখন আনন্দে একটা চিৎকার করে ওঠে। রাতুল হালটা ধরে পানির দিকে তাকাল। নসু ডাকাত পানিতে পড়ে ডুবে যাবার মানুষ নয়। সাঁতরে নিশ্চয়ই উঠে যাবে। কোথায় উঠবে সেটাই সে দেখতে চায়।

ট্রলারটা তখন জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছে। ঠিক তখন রাতুল এক ঝলকের জন্যে নসু ডাকাতকে দেখতে পেল। পানির ওপর মাথা তুলে একবার নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ডুবে যায়, মনে হয় জাহাজের সামনের দিকে যাচ্ছে। নিচে বেঁধে রাখা তিনজনকে খুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু রাতুল উদ্বিগ্ন মুখে পানির দিকে তাকিয়ে থাকে। ট্রলারটা জাহাজকে স্পর্শ করার সাথে সাথে রাতুলের মনে হলো নসু ডাকাতকে সে আরও একবার দেখতে পেয়েছে।

জাহাজের নোঙ্গর ধরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। সে লাফ দিয়ে জাহাজে নেমে চিৎকার করে বলল, ডাকাত! নসু ডাকাত! তারপর সে সামনের দিকে ছুটে যেতে থাকে।

ঠিক তখন শামসকে দেখা গেল। সে লাফ দিয়ে ট্রলারে উঠে রাজার হাত থেকে নসু ডাকাতের কাটা রাইফেলটা নিয়ে একটা বীরত্বসূচক ভঙ্গি করে দাঁড়াল। তারপর ভিতরে ঢুকে চোখ বেঁধে রাখা তিনটি মেয়েকে খুলে দিতে থাকে। গম্ভীর মুখে বলে, 'মেয়েরা, তোমাদের আর কোনো ভয় নেই। আমি চলে এসেছি।'

তৃষা অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে? কেমন করে আমাদের উদ্ধার করলেন?'

শামস কাটা রাইফেলটা ঘাড়ে নিয়ে নাটকীয়ভাবে বলল, 'সে অনেক বড় কাহিনী! আপাতত জেনে রাখো, তোমাদের কোনো ভয় নেই। আমি আছি।'

গীতি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শামস তার মাথায় হাত বুলায়ে বলল, কাঁদছ কেন বোকা মেয়ে! আমরা থাকতে তোমাদের নিয়ে যাবে– সেটা কি হতে পারে?

শামস যখন তিনজনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে এবং বস্তার ভেতর থেকে উদ্ধার করা দামি ক্যামেরাটি দিয়ে নিজেদের ছবি তুলছে, রাতুল তখন জাহাজের সামনে নসু ডাকাতকে খুঁজছে। তার সঙ্গে নসু ডাকাতকে খুঁজতে যারা এসেছে সবাই রেলিংয়ের ওপর থেকে মুখ নিচে করে তাকিয়ে আছে। নসু ডাকাতকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রাতুল জানে, সে আশেপাশে কোথাও আছে।

রাতুল হেঁটে হেঁটে একেবারে সামনে এসে যখন নিচের দিকে তাকিয়েছে ঠিক তখন সে পিছনে একটা শব্দ শুনতে পেল। মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতেই সে দেখে নসু ডাকাত হাতে একটা রড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড আক্রোশে সে রাতুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাতুল বিদ্যুৎ বেগে পাশে সরে গিয়ে কোনোভাবে নিজেকে রক্ষা করল। নসু ডাকাতের সাথে মারামারি করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু অন্যরা আসার আগে তার নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কলেজে পড়ার সময় সে কিছুদিন তাইকোয়ান্ডো ক্লাস করেছিল। রেড বেল্ট পর্যন্ত গিয়ে থেমে যেতে হয়েছিল। মাসে মাসে অনেক টাকা লাগে। টিউশনির টাকা দিয়ে এই বিলাসিতা সে কুলাতে পারেনি। তার ইন্সট্রাক্টর অবশ্য রাতুলকে নিয়ে খুব আশাবাদী ছিলেন। বলেছিলেন, ব্ল্যাক বেল্ট পর্যন্ত যেতে পারলে টুর্নামেন্টে সে নির্ঘাত কোনো একটা মেডেল পাবে। রাতুলের ধারণা ছিল, টুর্নামেন্টে মেডেল পাওয়াই হচ্ছে এ ধরনের মার্শাল আর্টের উদ্দেশ্য। নসু ডাকাতের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে এই প্রথম সে বুঝতে পারল, হয়তো তার অল্প কিছু ট্রেনিংই তাকে রক্ষা করবে। নসু ডাকাত যখন আবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন সে ঘুরে গিয়ে তার পা তুলে নসু ডাকাতের মুখে একটা লাথি মেরে দেয়। তাইকোয়ান্ডো ক্লাসে চেষ্টা থাকত কেউ যেন ব্যথা না পায়। এখন তার সব প্রচেষ্টা হচ্ছে মানুষটাকে আঘাত করা।

নসু ডাকাত লাথি খেয়ে নিচে পড়ে যায়। কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে সে রাতুলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর হিংস্র পশুর মতো রাতুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নসু ডাকাত রাতুলকে নিচে ফেলে দিয়ে তার ওপর বসে তাকে মারতে থাকে। রাতুল কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করে ছিটকে সরে আসে। একটু দূরে গিয়ে সে আবার পা তুলে নসু ডাকাতকে আঘাত করল। একবার দুইবার। তারপর অনেকবার।

নসু ডাকাত বুঝতে পারছে না, কেমন করে একজন শুকনো পাতলা মানুষ তাকে এভাবে মারতে পারে! সে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে ধড়াম করে নিচে পড়ে গেল। রাতুল রেলিং ধরে যখন বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে তখন দুজন ছুটে এসেছে। রাতুলকে দেখে বলল, 'কী হয়েছে?'

রাতুল হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ থেকে রক্ত মুছে নসু ডাকাতকে দেখিয়ে বলল, 'বেঁধে ফেল। এই ডাকাতটাকে কোনো বিশ্বাস নেই।'

রাতুল হাটতে গিয়ে অনুভব করল তার পায়ের কোনো একটা জায়গায় খুব ব্যথা পেয়েছে। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হেঁটে নিচে একটা বেঞ্চে বসে পা টাকে সামনে ছড়িয়ে দেয়। বুক থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস বের করে দিয়ে সে চোখ বন্ধ করে। ঠিক তখন জাহাজে একটা আনন্দোৎসব শুরু হয়েছে। শামসের নেতৃত্বে সব ডাকাতকে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে। শামস তাদের সামনে কাটা রাইফেল হাতে নাটকীয় একটা ভঙ্গি করে ছবি তুলল। জাহাজের বিভিন্ন ঘরে তালা মেরে আটকে রাখা খালাসি সারেং সবাইকে ছাড়ানো হলো। ঘুষি খাওয়া আনসারকে একটু প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হলো। জোয়ারের পানি বেড়ে গেছে বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটাকে ডুবোচর থেকে মুক্ত করে নেওয়া হলো। জাহাজটা যখন সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকে গেল এবং আবার টেলিফোন নেটওয়ার্কের ভেতর চলে এল তখন শামস তার নাটকীয় ছবিগুলো ফেসবুকে আপলোড করে সারা পৃথিবীতে প্রচার করে দিল।

বেঞ্চে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থেকে রাতুল টের পেল গা কেঁপে তার জ্বর আসছে। আসুক, এখন জ্বর এলে ক্ষতি নেই।

৪.

সদরঘাটে জাহাজটা থামার আগেই সবাই দেখতে পেল সেখানে টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে অনেক সাংবাদিক দাঁড়িয়ে আছেন। জাহাজটা জেটিতে লাগার সাথে সাথে তারা লাফিয়ে জাহাজে উঠে যান। একটু পরেই দেখা গেল শামস জাহাজের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে ইন্টারভিউ দিচ্ছে। ডুবোচরে জাহাজটা কেমন করে আটকে গেল, কেমন করে ডাকাতের দল আক্রমণ করল, কেমন করে তাদের পরাস্ত করা হলো– তার রোমহর্ষক বর্ণনা। রাতুল তার ব্যাকপেকটা ঘাড়ে নিয়ে সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। বাচ্চারা তাকে ঘিরে

ধরল। সে একজন একজন করে তাদের সবাইকে একবার বুকে চেপে ধরল।
রাতুল তৃষার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যে এদিক সেদিক তাকাল। সে কোথাও নেই। মনে হয় ওপরে টেলিভিশনের লোকজনের সঙ্গে আছে। শামস ইন্টারভিউ দিচ্ছে। সে হয়তো মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। রাতুল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে শুরু করে। জ্বরটা কমেছে, কিন্তু পায়ে এখনও অনেক ব্যথা। মনে হয় অনেক দিন ভোগাবে। জাহাজ থেকে নেমে সে জেটি ধরে হাঁটতে থাকে। তখন কোথা থেকে রাজা দৌড়ে এসে তার হাত ধরল। 'ভাই!'
'কী খবর রাজা?'
'আমারে একটা জিনিস বলবেন?'
'কী জিনিস?'
'আপনি সবকিছু করলেন, সব ডাকাত ধরলেন–'
'আমি একা তো না। তুমি ছিলে, অন্যরাও ছিল।'
'কিন্তু আপনি ছিলেন আসল। অন্য সবাই ফাউ।'
'কেউ ফাউ না। সবাই আসল।'
'কিন্তু টেলিভিশনের লোকেরা আপনার সাথে কথা না বলে ওই ভুয়া লোকটার সাথে কথা বলে কেন?'
রাতুল থামল, হাত দিয়ে রাজার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'আমার দিকে তাকাও। পায়ে জুতা নাই, খালি পা। শার্টটা দেখ, কত ময়লা। প্যান্টের অবস্থা দেখ, ছিঁড়ে গেছে। রক্ত লেগে আছে। মুখে খোঁচা দাড়ি। চুল জট পাকিয়ে গেছে। দেখে মনে হয় একজন ফালতু মানুষ। ঠিক কি না?'
'কিন্তু কিন্তু–'
'কোনো কিন্তু নাই। টেলিভিশনের লোকেরা আমার মতো ফালতু মানুষের কাছে আসে না। তারা যায় বিখ্যাত লোকের কাছে। যাদের চেহারা সুন্দর; যারা সুন্দর করে কথা বলতে পারে, তাদের দেখলে মানুষ খুশি হয়।'
রাজা মাথা নাড়ল। বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক হলো না ভাই। কিন্তু আপনি ছিলেন বলে সবাই বেঁচে গেছে। আপনার কী সাহস, কী বুদ্ধি! আমি তাজ্জব হয়ে যাই।'
'থ্যাংক ইউ রাজা।'
রাতুল তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাজার দিকে এগিয়ে দিল। সেও তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সেটাকে স্পর্শ করল। ভালোবাসার স্পর্শ। রাজা চোখ মুছে রাতুলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করল।
ঠিক তখন পুলিশ ডাকাতের দলটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। হাতকড়া অবস্থায় যেতে যেতে নসু ডাকাত দাঁড়িয়ে গেল। তৃষাকে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ছেলেটা কই?'
'কোন ছেলেটা?'
'যে আমাদের সবাইরে ধরল।'
তৃষা শামসকে দেখিয়ে বলল, 'এই যে।'
'ধুর। এই শালারে তো দেখি নাই কিছু করতে। হালকা-পাতলা ছেলেটা কই? যার জন্যে আমরা ধরা পড়লাম।' শামসের মুখ লাল হয়ে উঠল। তৃষাকে বলল, 'চলো যাই।'
তৃষা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কোন ছেলেটা?'
নসু ডাকাত হঠাৎ জেটিতে রাতুল আর রাজাকে দেখতে পায়। মুখ দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে যাচ্ছে। সাথে বিচ্ছু পোলাটাও আছে!'
'রাতুল? রাজা?'
নসু ডাকাত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তোমাদের খুব কপাল ভালো জাহাজে ছেলেটা ছিল। তোমাগো উপর নিশ্চয়ই আল্লাহর দোয়া আছে। তা না হলে এই জাহাজেই এই ছেলে থাকে? বাপরে বাপ! কী সাহস! মাথার মধ্যে কী বুদ্ধি! মানুষ না– একেবারে বাঘের বাচ্চা।'
'বাঘের বাচ্চা!'
'হ্যাঁ। কোনোদিন চিন্তা করি নাই নসু ডাকাতরে কেউ ধরতে পারবে! কিন্তু আমি এর কাছে পারলাম না। একেবারে বাঘের বাচ্চা। এর পা ধরে সালাম করা দরকার।'
পুলিশ তখন হ্যাঁচকা টান দিয়ে নসু ডাকাতকে অন্যদের সাথে টেনে সরিয়ে নিয়ে যায়। তৃষা ঘুরে শামসের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'আসলে কী হয়েছিল শামস ভাই? আসলে কে আমাদের উদ্ধার করেছিল?'
শামস আমতা আমতা করে বলল, 'না মানে ইয়ে–'
তৃষা একদৃষ্টিতে শামসের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে আর অবাক হয়ে আবিষ্কার করে, মানুষটি কী বিচিত্রভাবে দুমড়েমুচড়ে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে!
রাজাকে বিদায় দিয়ে রাতুল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ শুনতে পেল পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে ডাকছে– 'রাতুল, রাতুল।'
রাতুল ঘুরে তাকাল। তৃষা ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে সে খপ করে রাতুলকে ধরল। ছুটে এসেছে বলে এখনও হাঁপাচ্ছে।
রাতুল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তৃষা?'
'তুই... তুই...' তৃষা কথা বলতে পারল না। হঠাৎ ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।
রাতুল অবাক হয়ে বলল, 'কী হলো? কাঁদছিস কেন?'
'আমাকে কেউ কিছু বলেনি।'
'কী বলেনি?'
'তুই সবাইকে বাঁচানোর জন্যে কী করেছিস! কী সাংঘাতিক কাণ্ড করেছিস! আমি কিছু জানতাম না। একটু আগে যখন নসু ডাকাত বলল–'
'নসু ডাকাত! কী বলেছে?'
'বলেছে, তুই বাঘের বাচ্চা। বলেছে, সবার তোর পা ধরে সালাম করা উচিত। বলেছে–'
তৃষা আবার কাঁদতে শুরু করে। রাতুল এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, 'তুই কান্না থামাবি? চারপাশে সবাই ভাবছে, আমি তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, আর তাই তুই কাঁদছিস। এক্ষুণি কান্না থামা। তা না হলে পাবলিক ধরে আমাকে পিটিয়ে দেবে।'
'তুই আমাকে ধরে একটু মায়া করে দে, প্লিজ–'
রাতুল হাত দিয়ে তৃষাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাঁদিস না প্লিজ। তোকে কাঁদতে দেখলে আমার ভিতরে সব ওলটপালট হয়ে যায়।'
তৃষা চোখ মুছে বলল, 'তুই আমাকে ধরে রাখ। তাহলে আমি কাঁদব না।'
রাতুল তৃষাকে শক্ত করে ধরে বলল, 'এই যে ধরেছি।'
তৃষা তখন চোখ মুছে বলল, 'আমি খুব বোকা।'
'ধুর! বোকা কেন হবি?'
তৃষা মাথা নেড়ে বলল, 'আমি জানি, আমি আসলে খুব বোকা। কিন্তু তুই আমার চাইতেও বোকা।'
রাতুল বলল, 'তাহলে বোকাই ভালো। আমি বোকা তুই বোকি। দুইজন বোকাবুকি!' তৃষা হি হি করে হাসল। রাতুল বলল, 'তাহলে আমরা দুইজন আবার বন্ধু?'
তৃষা মুখ টিপে হাসল। বলল, 'বন্ধু থেকে বেশি।'
রাতুল চোখ বড় বড় করে বলল, 'বন্ধু থেকে বেশি?'
'হ্যাঁ।'
'কত বেশি? একটুখানি?'
তৃষা মাথা নাড়ল, 'না। মনে হয় অনেকখানি।'
রাতুল তৃষার চোখের দিকে তাকাল। তৃষা রাতুলের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখ নামিয়ে নেয়। সদরঘাটের ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাতুলের মনে হলো চারপাশে কোনো মানুষ নেই, ভিড় নেই, গাড়ি নেই। রিকশা, দোকানপাট– কিচ্ছু নেই। তার মনে হলো, বুঝি শুধু তারা দুই জন হাঁটছে। শুধু দুই জন। ❖

আশিয়ান শীতলছায়া